আন্তন চেখভ

গল্প ও ছোটো উপন্যাস

শিল্পী হিসেবে চেখভের তুলনা নেই। বাস্তবিকই তাই—তুলনাহীন! জীবন-শিল্পী তিনি। তাঁর বইগুলির গুণে — শুধু প্রত্যেক রুশীর কাছে নয় প্রত্যেক মানুষের কাছেই সেগুলি বোধগম্য এবং সগোত্রজ ...

লেভ তলস্তয়

রাশিয়া বহুকাল তাঁকে মনে রাখবে এবং জীবনকে বুঝতে শেখার জন্য বহুকাল তাঁর রচনা পড়বে। তাঁর রচনা স্নেহশীল হৃদয়ের বিষণ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত, তাঁর গল্পে সর্বত্রই জীবন সম্বন্ধে প্রগাড় জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ...

স্টাইলের দিক থেকে চেখভকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে রুশ ভাষার ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করার সময় বলতেই হবে যে এই ভাষা পুশকিন, তুর্গেনেভ এবং চেখভের সৃষ্টি।

মাক্সিম গোর্কি

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যত আশাবাদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে আন্তন চেখভ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাশিয়ার সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হবে তার বর্ণনা করার সময় সর্বদাই তিনি প্রফুল্ল ও সজীব হয়ে উঠতেন। সেই ভবিষ্যতের প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। বর্তমানের বর্ণনা করতেন মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে, সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হতেন না।

ক. স. স্তানিস্লাভস্কি

А. Чехов

আন্তন চেখভ * গল্প ও ছোটো উপন্যাস

А. П. ЧЕХОВ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

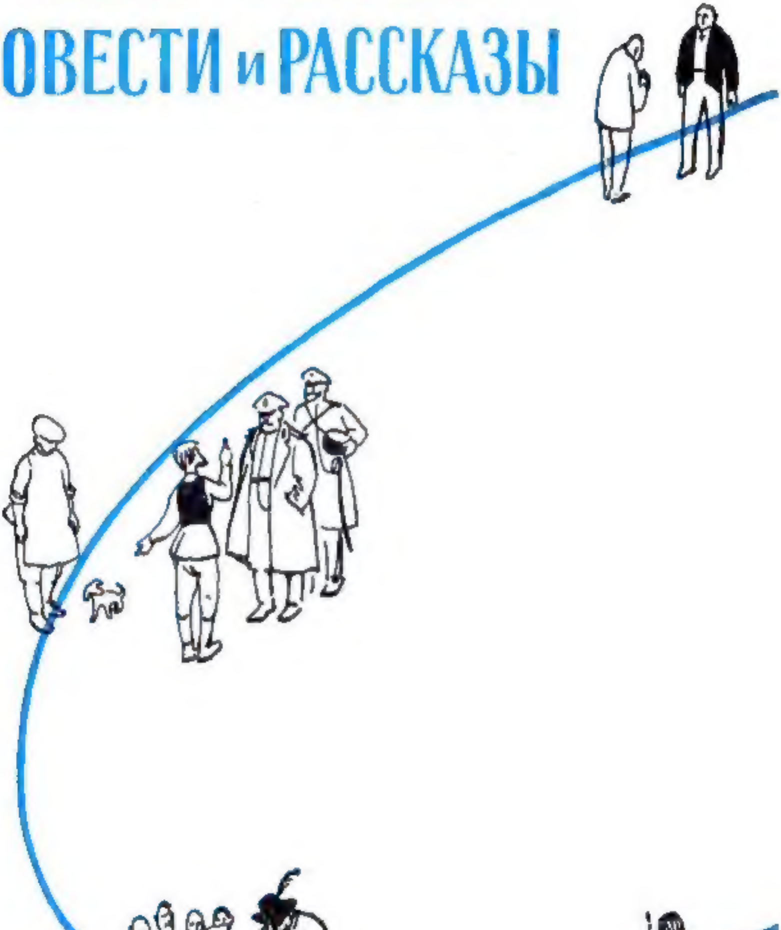

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА

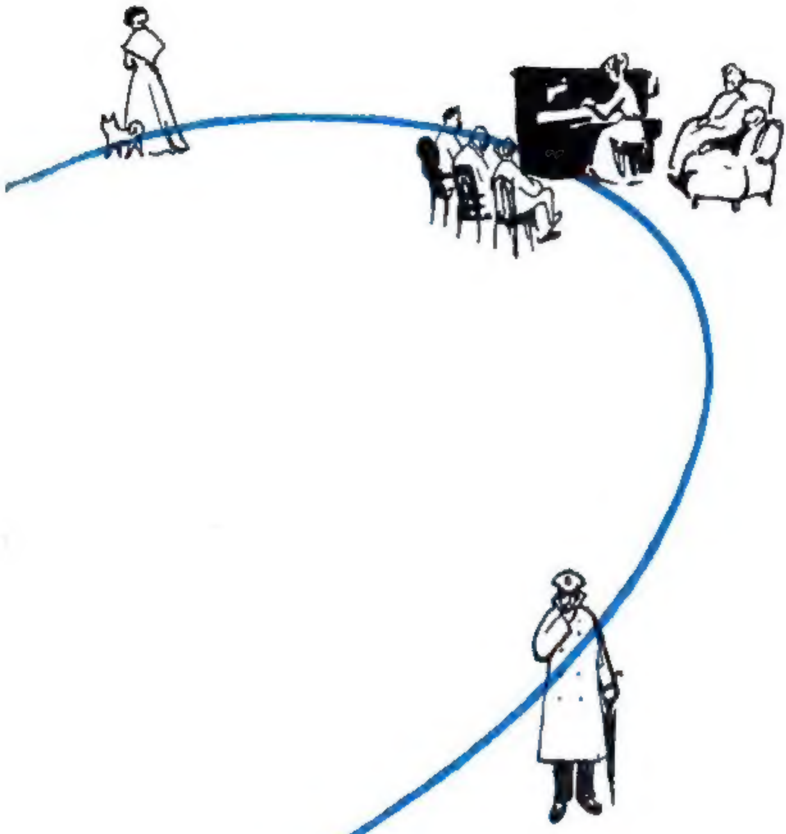

আন্তন চেখভ

গল্প ও ছোটো উপন্যাস

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. ত্রিফনভ

সূচীপত্র

কেরানির মৃত্যু . ৭

বহুরূপী ১১

মুখোশ . ১৬

শোক . . ২৪

শত্রু ৩২

বিরস কাহিনী (এক বন্ধুর নোট-বই থেকে) ৫০

প্রজাপতি ১৩৩

৬নং ওয়ার্ড ১৬৩

বনেদী বাড়ি (শিল্পীর গল্প) ২৩৫

ইয়োনিচ ২৫৯

খোলসের লোক ২৮৪

গুজবেরি ৩০২

কুকুরসঙ্গী মহিলা ৩১৬

নালায় ৩৪০

কনে ৩৯৩

কেরানির মৃত্যু

অপরূপ একরাতে নাম-করা কেরানি ইভান দ্‌মিত্রিচ্ চেরভিয়াকভ* স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে অপেরা গ্লাস দিয়ে 'লা ক্লশে দ্য কর্ণেভিল্' অভিনয় দেখছিলেন। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হচ্ছিল, মরজগতে তাঁর মতো সুখী বুঝি আর কেউ নেই। এমন সময় হঠাৎ ... 'হঠাৎ' কথাটা বড়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু কী করা যায় বলুন, জীবনটা এতই বিস্ময়ে ভরা যে কথাটা ব্যবহার না করে লেখকদের গত্যন্তর নেই! সুতরাং, হঠাৎ, ওঁর মুখখানা উঠল কুঁকড়ে, চক্ষু শিবনেত্র, শ্বাস অবরুদ্ধ... এবং অপেরা গ্লাস থেকে মুখ ফিরিয়ে সিটের ওপর ঝুঁকে পড়ে — হ্যাঁচ্চো! অর্থাৎ হাঁচলেন। হাঁচার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে, এবং যেখানে খুশি। কে না হাঁচে — চাষী হাঁচে, বড়ো দারোগা হাঁচে, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলররাও মাঝে মাঝে হাঁচে, হাঁচে সবাই। কাজেই চেরভিয়াকভ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক মুছলেন, এবং সভ্যভব্য মানুষের মতো আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন কারুর কোন অসুবিধা হল কিনা। আর তাকাতে গিয়েই বিব্রত হতে হল তাঁকে। কেন না, চোখে পড়ল ঠিক তাঁর সামনে, প্রথম সারিতে একটি খর্বকায় বৃদ্ধ দস্তানা দিয়ে টেকো ব্রহ্মতালুটুকু এবং ঘাড়খানা সযত্নে মুছে বিড় বিড় করে কী বলছেন। বৃদ্ধটিকে চেরভিয়াকভ চিনতে পারলেন, তিনি ছিলেন যানবাহন মন্ত্রিদপ্তরের বেসামরিক জেনারেল ব্রিঝালভ।

---

* চেরভিয়াক থেকে চেরভিয়াকভ। রুশ ভাষায় চেরভিয়াক মানে কীট।

চেরভিয়াকভ ভাবলেন, 'সর্বনাশ, ও'র মাথার ওপরেই হে'চে ফেলেছি তাহলে! উনি অবিশ্যি আমার বড়ো সায়েব নন, তবু কাজটা খারাপ হয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে নেওয়া দরকার।'

একটু কেসে চেরভিয়াকভ সামনে ঝু'কে জেনারেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন স্যার, হে'চে ফেলেছি, ... অনিচ্ছায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে ...'

'ভগবানের দোহাই, আপনি আমায় মাফ করুন। আমি ... মানে ব্যাপারটা ঠিক ইচ্ছে করে ঘটেনি।'

'কী জ্বালা, থামুন দিকি! শুনতে দিন!'

কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে চেরভিয়াকভ বোকার মতো হাসলেন। তারপর মঞ্চের দিকে চোখ ফিরিয়ে অভিনেতাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাকালেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর মরজগতের সবচেয়ে সুখী মানুষটি বলে নিজেকে ভাবতে পারলেন না। অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিলেন তিনি। ইণ্টারভালের সময় হতে চলে এলেন ব্রিঝালভের কাছে। একটু ইতস্তত করে সঙ্কোচ কাটিয়ে গুই-গুই করে শুরু করলেন, 'আপনার গায়ের ওপর তখন হে'চে ফেলেছিলাম, স্যার ... আমাকে মাফ করুন ... মানে ... ব্যাপারটা আমি ঠিক ইচ্ছে করে করিনি ...'

জেনারেল বললেন, 'ও, তাই নাকি ... আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কি এমনি ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবেন?' নিচের ঠোঁটটা অধৈর্যে বে'কে উঠল তাঁর।

চেরভিয়াকভ কিন্তু জেনারেলের দিকে অবিশ্বাস ভরে তাকালেন। তাঁর মনে হল, 'উনি তো বলে দিলেন ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু কই, ওঁর চোখমুখ দেখে তো ভালো ঠেকছে না। আসলে আমার সঙ্গে কথা কইতেই উনি নারাজ। উ'হু, ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতেই হবে যে ওটা আমি ইচ্ছে করে করিনি .. এ হল গিয়ে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। নইলে উনি হয়ত মনে করবেন আমি বুঝিবা ও'র গায়ের ওপর থুথু ফেলতেই চাইছিলাম। এখন সে কথা যদি বা নাও ভাবেন পরে যে ভাববেন না তার ঠিক কি!..'

বাড়ি ফিরে চেরভিয়াকভ তাঁর অশিষ্ট আচরণের কথা স্ত্রীর কাছে খুলে

বললেন। মনে হল স্ত্রী যেন বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। প্রথমে অবশ্য তাঁর স্ত্রীও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যেই শুনলেন ব্রিঝালভ ওঁদের আপিসের কর্তা নন, অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তবু পরামর্শ দিলেন, 'তা যাই হোক, ওঁর কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। নইলে উনি হয়ত ভাববেন, তুমি ভদ্রতাও জানো না।'

'ঠিক বলেছো। ক্ষমা চাইতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ভারি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। যা বললেন তার মানেই হয় না। তাছাড়া তখন আলাপ করার মতো সময়ও ছিল না।'

পরদিন চেরভিয়াকভ আপিস যাবার নতুন ফ্রককোটটি গায়ে চাপিয়ে, চুলটুল ছেঁটে ব্রিঝালভের কাছে গেলেন তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দাখিল করতে। জেনারেলের বসবার ঘরখানা দরখাস্তকারীদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। জেনারেল স্বয়ং হাজির থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করছেন। জনকয়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে জেনারেল চেরভিয়াকভের দিকে চোখ তুলে চাইলেন।

কেরানিটি শুরু করলেন, 'বলছিলুম কি, স্যারের বোধহয় মনে আছে, কাল রাত্রে, সেই যে আর্কাডিয়া থিয়েটারে আমি, মানে হেঁচে ফেলেছিলাম, মানে হাঁচি এসে গিয়েছিল ... দয়া করে ক্ষমা!..'

'কী জ্বালা! আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়েছি তো!' বলে জেনারেল পরবর্তী লোকটিকে উদ্দেশ করে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁ, আপনার কী দরকার বলুন?'

চেরভিয়াকভের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবলেন, 'আমার কথা উনি শুনতেই চান না! তার মানে উনি চটে গিয়েছেন। কিন্তু ওঁকে এরকম চটিয়ে রাখা তো ঠিক হবে না ... ওঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার ...'

সর্বশেষ দরখাস্তকারীর সঙ্গে কথা শেষ করে জেনারেল যখন তাঁর খাস-কামরার দিকে পা বাড়িয়েছেন, অমনি চেরভিয়াকভ গিয়ে তাঁর পিছু ধরলেন এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'মাপ করবেন, আমার এমন একটা আন্তরিক অনুশোচনা হচ্ছে যে আপনাকে আবার বিরক্ত না করে পারছি না...।'

জেনারেল এমনভাবে চেরভিয়াকভের দিকে তাকালেন যেন বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। হাত নেড়ে চেরভিয়াকভকে ভাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে নিয়ে তামাসা পেয়েছেন, না?' কেরানির মুখের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

■

'তামাসা!' চেরভিয়াকভ ভাবলেন, 'এর মধ্যে তামাসার কী আছে। জেনারেল হয়েও কিন্তু কথাটা বুঝতে পারছেন না? বেশ, মাপ চাইতে গিয়ে ভদ্রলোককে আমিও আর বিরক্ত করতে আসছি না। চুলোয় যাক! বরং একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া যাবে, বাস। এই শেষ, আর কখনো আসছি না ও'র কাছে।'

বাড়ি যেতে যেতে চেরভিয়াকভের চিন্তা এই ধরনের একটা খাতে বইছিল। চিঠিখানা কিন্তু তাঁর আর লেখা হয়ে উঠল না। ভেবে ভেবে কিছুতেই ঠাহর করতে পারলেন না, কথাগুলো কী করে সাজাবেন। সুতরাং ব্যাপারটা ফয়সালা করে নেবার জন্যে পরের দিন আবার তাঁকে যেতে হল জেনারেলের কাছে।

জেনারেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই চেরভিয়াকভ শুরু করলেন, 'গতকাল আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হয়েছিল, কিন্তু তার মানে আপনি যা বলতে চাইছিলেন তা নয়। রসিকতা করার কোন মতলবই আমার ছিল না। সেদিন হে'চে ফেলে আপনার যে অসুবিধা ঘটিয়েছিলাম, তার জন্যে মাপ চাইতেই এসেছিলাম... আপনাকে নিয়ে রসিকতা করার কথা আমার মনেই হয়নি। তাই কখনো হয়! লোককে নিয়ে রসিকতা করার ইচ্ছে যদি একবার আমাদের পেয়ে বসে তাহলে কোথায় থাকবে মানসম্মান, কোথায় থাকবে আমাদের ওপরওয়ালাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা?...'

রাগে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেনারেল হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো! আভি নিকালো!'

আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে চেরভিয়াকভ বললেন, 'আজ্ঞে?'

পা ঠুকে জেনারেল ফের চে'চিয়ে উঠলেন 'আভি নিকালো!'

চেরভিয়াকভের মনে হল বুঝি ওঁর শরীরের মধ্যে কী একটা যন্ত্র যেন বিকল হয়ে গেছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। দরজা দিয়ে কোনো মতে পেছিয়ে এসে হোঁচট খেতে খেতে চেরভিয়াকভ হাঁটতে শুরু করলেন। আচ্ছন্নের মতো বাড়ি পেঁছে আপিসের ফ্রককোট সমেতই সোফার উপর শুয়ে পড়ে মরে গেলেন।

বহুরূপী

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ওচুমেলভ* হে'টে যাচ্ছিলেন বাজারের মধ্যে দিয়ে। গায়ে তাঁর নতুন ওভারকোট, হাতে পুটুলি এবং পিছনে এক কনেস্টবল। চুলের রঙ্‌টা তার লাল, হাতের চালুনিটা ভর্তি হয়ে গেছে বাজেয়াপ্ত-করা গুজ্‌বেরিতে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই ... বাজার একেবারে খালি ... ক্ষুদে ক্ষুদে দোকান আর সরাইখানার খোলা দরজাগুলো যেন একসার ক্ষুধার্ত মুখ-গহ্বরের মতো দীনদুনিয়ার দিকে হাঁ করে আছে। ধারে কাছে একটি ভিখিরি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কামড়াতে এসেছ হতচ্ছাড়া, বটে? ওকে ছেড়ো না হে। কামড়ে বেড়াবে সে আইন নেই আর। পাকড়ো পাকড়ো! হেই!'

কুকুরের ঘ্যান ঘ্যান ডাকও শোনা গেল একটা। ওচুমেলভ সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, পিচুগিন দোকানীর কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে এসে একটি কুকুর তিন ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে ছুটছে আর তার পেছু পেছু তাড়া করেছে একটি লোক, গায়ে তার মড়মড়ে ইস্ত্রির ছাপা কাপড়ের জামা, ওয়েস্টকোটের বোতাম সব খোলা, সারা শরীর ঝু'কে পড়েছে সামনের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকটা কুকুরের পিছনের পাটা চেপে ধরল। কুকুরটা আবার কে'উ কে'উ করে উঠল, আবার চিৎকার শোনা গেল, 'পাকড়ো, পাকড়ো!' দোকানগুলো থেকে উ'কি মারতে লাগল নানা তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখ। দেখতে দেখতে যেন মাটি ফু'ড়ে ভিড় জমে উঠল কাঠগোলার কাছে।

কনেস্টবল বললে, 'বেআইনী হল্লা বলে মনে হচ্ছে, হুজুর।'

---

* ওচুমেলি কথার অর্থ ক্ষিপ্ত। তাই থেকে ওচুমেলভ।

ওচুমেলভ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুমদুম করে গেলেন ভিড়টার কাছে। কাঠগোলার ফটকটার ঠিক সামনেই তাঁর নজরে পড়ল বোতাম খোলা ওয়েস্টকোট-পরা সেই মূর্তিটি দাঁড়িয়ে। ডান হাত উঁচু করে লোকটা তার রক্ত মাখা আঙুলখানা সবাইকে দেখাচ্ছে। তার মাতাল চোখমুখগুলো যেন বলছে, 'শালাকে দেখে নেবো।' আঙুলটা যেন তার দিগ্বিজয়েরই নিশান! লোকটাকে ওচুমেলভ চেনেন — স্যাকরা খ্রিউকিন্।* ভিড়ের ঠিক মাঝখানটায় বসে আছে আসামী, অর্থাৎ বর্জোই জাতের একটি বাচ্ছা কুকুর — চোখা নাক, পিঠের ওপর হলদে একটা ছোপ। সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে। সামনের দুপা ফাঁক করে সে বসে, সজল দুই চোখে ক্লেশ আর আতঙ্কের ছাপ।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে ওচুমেলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী? কী লাগিয়েছো তোমরা? আঙুল তুলে রেখেছিস কী জন্যে? চিল্লাচ্ছিল কে? কে চিল্লাচ্ছিল?'

খ্রিউকিন মুঠো-করা হাতের ওপর একটু কেশে নিয়ে শুরু করলে, 'আমি, হুজুর, হেঁটে যাচ্ছিলাম নিজের মনে, কারুর কোনো ক্ষেতি না করে। ওই তো ওই রয়েছে মিত্রি মিত্রিচ্ — উর ঠেঁয়ে লকড়ীর দরকার ছিল হুজুর — তা খামকা, হুজুর, এই কুত্তার বাচ্ছাটা এসে কামড়ে দিলে একেবারে। বুঝুন হুজুর, মেহনত করে খেতে হয় আমাদের ... আমার ব্যবসার কাজটিও তেমন সাদা-মাটা নয় হুজুর — এর লেগে ক্ষেতিপূরণ করা করান উদিকে। যা গতিক তাতে আঙুলটি তো আর হপ্তাখানেক নড়াচড়া চলবে না। আইনে তো ইসব নাই হুজুর কি বুনো জানোয়ার-মানোয়ারদের সহ্য করতে হবে আমাদের? সব কিছুই যদি কামড়াতে লেগে যায় তবে জীবনে সুখ কী রইল, আজ্ঞা?'

'হুম্! বটে! গলাখাঁকারি দিয়ে ভুরু কুঁচকে ওচুমেলভ বললেন কড়া সুরে, 'বটে, আচ্ছা! .. কার কুকুর এটা? এ আমি সহজে ছাড়ছি না! কুকুর ছেড়ে রাখার মজাই দেখিয়ে ছাড়ব! যেসব ভদ্রলোক আইন মেনে চলতে চান না তাঁদের ওপর মন দেবার সময় এসেছে। শালার ওপর এমন জরিমানা

---

* খ্রিউ খ্রিউ — অর্থ শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

চাপাবো যে শিক্ষা হয়ে যাবে: যতো রাজ্যের গর্ ভেড়া কুকুরকে চরতে ছেড়ে দেওয়ার মানে কী! কতো ধানে কতো চাল তা টের পাওয়াচ্ছি!'

কনেস্টবলের দিকে ফিরে ওচুমেলভ হাঁকলেন, 'এল্‌দীরিন, তল্লাস লাগাও কার কুত্তা, আর একটা এজাহারও লিখে ফেলো। যা মনে হচ্ছে এ কুকুর ক্ষ্যাপা না হয়ে যায় না - ওটাকে সাবাড় করে ফেলা দরকার এখুনি! .. কার কুকুর এটা, জবাব দাও, কার কুকুর?'

ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে ওটা জেনারেল ঝিগালভের কুকুর।'

'জেনারেল ঝিগালভ? হুম্‌! ... এল্‌দীরিন, আমার কোটটা খুলে দাও ... উহ্‌ কি গরম! বোধ হয় বৃষ্টি পড়বে। ইনস্পেক্‌টর খ্রিউকিনের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, তোকে কামড়ালো কী করে? একেবারে হাতের আঙুলে গিয়ে কামড় বসালো, এটা কী রকম? এইটুকু একটা বাচ্চা কুকুর আর তুই বেটা এমন এক মদ্দ জোয়ান? আলবৎ ও আঙুল তুই পেরেক-মেরেকে খুঁচিয়ে এখন মতলব করেছিস ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় কিনা। তোদের চিনতে তো আমার বাকি নেই, শয়তানের ঝাড় সবাই!'

'ও লোকটা, হুজুর, তামাসা করে কুকুরটার নাকে সিগারেটের ছে'কা দিতে গিয়েছিল। কুকুরটাও অমনি কামড় লাগিয়েছে। ঐ খ্রিউকিন হুজুর, চিরকালই বদমাইসি করে বেড়ায়।'

'মিছে কথা বলছিস, ট্যারা চোখো কোথাকার! আমাকে ছে'কা দিতে দেখেছো? তবে মিছে কথা বলছো কেনে? হুজুরের বুদ্ধি বিবেচনা আছে। উনি নিজেই বুঝতে পারবেন কে মিছে বলছে, কে ধম্মকথা বলছে। মিছে কথা বললে আদালতে তার বিচার হোক কেনে। আইন হয়ে গেইছে ... সব মানুষ এখন সমান বটে। না জানো তো বলি, আমারও এক ভাই পুলিসে আছে ...'

'তর্ক কোরো না, তর্ক কোরো না বলছি!'

'উঁহু, এটা জেনারেলের কুকুর নয়,' কনস্টেবল বললে বিচক্ষণের মতো, 'অমন কোনো কুকুরই নেই জেনারেলের। ওনার সবকটা কুকুরই শিকারী কুকুর।'

'ঠিক জানিস?'

'ঠিক জানি, হুজুর।'

'ঠিকই বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম! জেনারেলের কুকুরগুলো সব দামী দামী, উঁচুজাতের কুকুর। আর এটা তাকাতেই ইচ্ছে করে না, হতকুচ্ছিৎ খেঁকি একটা। অমন কুকুর কেউ পোষে নাকি? তোদের মাথা খারাপ? মস্কো কি পিটার্সবুর্গে ওরকম কুকুর দেখা গেলে কী হত জানো? আইন দেখত না ছাই, পেলেই দফা শেষ করে ছাড়ত। খিরউকিন, তোমাকে কামড়েছে মনে রেখো, সহজে ব্যাপারটা ছাড়া হবে না। শিক্ষা দেওয়া দরকার! সময় হয়েছে ...'

কনেস্টবল আপন মনে বলতে শুরু করলে, 'তা জেনারেলের কুকুরও হয়ে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত। চেহারা দেখে কি কিছু বলা যায়। সেদিন জেনারেলের উঠোনে এমনি একটা কুকুর দেখেছিলাম যেন।'

'জেনারেলের কুকুরই তো বটে!' ভিড় থেকে কে একজন বললে।

'হুঁ! ... এলদীরিন কোটটা পরিয়ে দে ... দমকা হাওয়া দিল কেমন, শীত করছে... জেনারেলের কাছে এটাকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়। বলবি, আমি কুকুরটাকে পেয়ে পাঠিয়েছি। বলবি, অমন করে যেন রাস্তায় ছেড়ে না দেন। হয়ত বা দামী কুকুর। শুয়োরগুলো যদি সবাই সিগারেট দিয়ে অমন করে নাকে ছ্যাঁকা দিতে থাকে তবে অমন দামী কুকুরের বারোটা বেজে যেতে কতোক্ষণ? কুকুর হল গিয়ে আদুরে জীব ... আর তুই ব্যাটা আহাম্মক, হাত নামা শীগগির! উজবুকের মতো আঙুল দেখাচ্ছিস কাকে? তোরই তো দোষ!..'

'ওই তো জেনারেলের বাবুর্চি এসে গেছে। ওকেই জিগ্যেস করা যাক ... ওহে, ও ভাই প্রোখর, এসো তো বাপু একটু! দেখতো ভালো করে, কুকুরটা কি তোমাদের?'

'মানে! কস্মিনকালেও অমন কোনো কুকুর আমাদের ছিল না।'

'বাস, বাস! ব্যাপারটা বোঝা গেল তাহলে।' ওচুমেলভ বললেন, 'বেওয়ারিশ একটা কুকুর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলতানি করে আর কী হবে। বলছি বেওয়ারিশ কুকুর, বাস, ওটাকে খতম করে ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়া যাক।'

প্রোখর কিন্তু বলে চলল, 'এটা আমাদের নয়। এই কিছুদিন হল জেনারেলের ভাই এসেছেন, এটা তাঁরই কুকুর। বর্জেহি জাতের কুকুর সম্পর্কে

আমাদের জেনারেলের কোনোই শখ নেই। কিন্তু ওঁর ভাই — ওঁর পছন্দ হল গিয়ে ...'

'কী বললে, জেনারেলের ভাই? ভ্লাদিমির ইভানিচ্ এসেছেন?' ওচুমেলভ চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর সারা মুখ ভরে উঠল এক অপার্থিব হাসিতে, 'কী কাণ্ড। আর আমি কিনা জানি না! এখন থাকবেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, থাকবেন।'

'কী কাণ্ড। ভাইকে দেখতে এসেছেন। আর আমি খবর পাইনি! কুকুরটা তাহলে ওঁরই? ভারি আনন্দের কথা। নাও হে নাও ওটিকে .. তোফা ছোট্ট কুকুরটি। ওর আঙুলে কামড়ে দিয়েছিলি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তু-তু, আরে কাঁপছিস কেন? ... বিচ্ছুটা চটেছে ... কী তোফা বাচ্চা!'

প্রোখর কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে কাঠগোলা থেকে চলে গেল। ভিড়ের লোকগুলো হেসে উঠল খ্রিউকিনের দিকে চেয়ে। ওচুমেলভ হুমকি দিলেন, 'দাঁড়া না, তোকে আমি দেখাচ্ছি পরে!' তারপর ওভারকোটটা ভালো করে গায়ে টেনে নিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললেন।

১৮৮৪

মুখোশ

ন· ভদ্রলোকদের ক্লাবে চ্যারিটি বল্‌নাচ চলেছে। ফ্যান্সি-ড্রেস বলনাচ। স্থানীয় তরুণী মহিলারা অবশ্য এ ধরনের অনুষ্ঠানকে 'জোড়া নাচের আসর' বলে থাকেন।

মধ্যরাত্রি। বারোটা বেজেছে। একদল বুদ্ধিজীবী নাচে নামেনি বা মুখোশ পরেনি। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। পড়ার ঘরে বড়ো টেবিলটার চারদিকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নাক এবং দাড়ি গুঁজড়ে বসে। বসে বসে পড়ছে এবং ঢুলছে। মস্কো ও পিটার্সবুর্গের খবরের কাগজের স্থানীয় বিশেষ প্রতিনিধির ভাষায় বলতে গেলে, সবিশেষ উদারমনোভাবাপন্ন ভদ্রলোকটি — 'অনুধ্যানরত'।

নাচের ঘর থেকে ভেসে আসছে কোয়াড্রিল নাচের বাজনা। কাঁচের বাসনের ঝনঝন শব্দ তুলে পা ঠুকে খোলা দরজার কাছে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা। কিন্তু পড়ার ঘরে একটুও গোলমাল নেই।

হঠাৎ এই নিঃশব্দতাকে ভঙ্গ করে একটা চাপা ও নিচু গলার স্বর শোনা গেল। মনে হল যেন চিমনির ভিতর থেকে শব্দটা আসছে।

'এই তো, পাওয়া গেছে, এই ঘরটাতেই আরাম করে বসা যাক। চলে এসো, এই যে এদিকে!'

দরজাটা খুলে গেল। পড়বার ঘরে ঢুকল চওড়া কাঁধ, গাঁট্টাগোট্টা একটি পুরুষ। তার পরনে কোচোয়ানদের মতো উর্দি, টুপিতে ময়ূরের পালক গোঁজা, মুখে মুখোশ পরা। লোকটির পিছনে দুজন মহিলা আর ট্রে হাতে একজন ওয়েটার। মহিলা দুজনও মুখোশ আঁটা। ট্রের উপরে রয়েছে লিকিয়রের একটা পেটমোটা বোতল, লাল মদের তিনটে বোতল আর কয়েকটা গ্লাস।

লোকটি বলল, 'এই যে এদিকে। এ জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। কই হে, টেবিলের ওপর ট্রে-টা রাখ দিকি। আপনারা বসুন, মাদ্‌মোয়াজেল। জে ভু

পাস আ ল্যা ব্রিমনত্রান আর মশাইরা শুনুন, জায়গা দিন তো ... আপনাদের জন্যে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।'

এই বলে খানিক টলে উঠে সে টেবিলের উপর থেকে খানকয়েক পত্রিকা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'এই যে, রাখ এখানে। আর পড়ুয়া মশাইরা, আপনারা জায়গা দিন! আপনাদের ওই খবরের কাগজ আর রাজনীতির সময় এটা নয় ... এখন ওসব রেখে দিন!'

'আপনি হৈ-হট্টগোলটা আরেকটু কম করবেন কি!' চশমার ভিতর দিয়ে মুখোশ-পরা লোকটিকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে একজন পড়ুয়া বলল, 'এটা পড়বার ঘর, মদের বার নয় ... মদ খাবার জায়গাও নয় এটা।'

'আহা, কী কথাই বললেন! টেবিলটা কি স্থির হয়ে নেই, কিম্বা ঘরের ছাদ কি মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়ছে? উদ্ভট সব কথা আপনাদের! যাক গে, এখন আর আমার কথা বলবার সময় নেই। কাগজ পড়া শেষ করুন ... যথেষ্ট পড়া হয়েছে, আর না পড়লেও চলবে। এমনিতেই আপনাদের মগজে বুদ্ধির কমতি নেই। তাছাড়া বেশি পড়লে চোখের মাথা খেয়ে বসবেন। অবিশ্যি আমার তাতে বয়েই যাবে। মোদ্দা কথা — আমি চাই না আপনারা এখানে থাকেন। বাস, এই হচ্ছে শেষ কথা!'

টেবিলের ওপরে ট্রে-টা রেখে হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে ওয়েটার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। মহিলারা কাল বিলম্ব না করে লাল মদ নিয়ে বসেছেন।

ময়ূরের পালক গোঁজা লোকটি নিজের জন্যে খানিকটা লিকিয়র ঢেলে নিয়ে বলল, 'আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো ভাবতেও পারি না, কোনো বুদ্ধিমান লোক এমন চমৎকার পানীয়ের চেয়েও খবরের কাগজকে বেশি পছন্দ করতে পারে! আমার কী মনে হয় জানেন মশাইরা, আপনাদের পয়সা নেই বলেই খবরের কাগজ ভালোবাসেন। ঠিক কথা বলিনি? হা হা!.. দ্যাখ, দ্যাখ, পড়ার ঢঙ দ্যাখ! আপনাদের খবরের কাগজে কী লেখা আছে মশাইরা? ও মশাই চশমাপরা ভদ্দরলোক, কোন তথ্য নিয়ে পড়ছেন? হা-হা! বাস, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! তোমার মুরুব্বিপনা আর বাইরের ঠাট রাখ তো! এস মদ খাওয়া যাক!'

বলতে বলতে ময়ূরের পালক গোঁজা লোকটি ঝুঁকে পড়ে চশমাপরা ভদ্রলোকের হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিল। ব্যাপারটা দেখে ভদ্রলোক প্রথমে লাল তারপরে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অন্য বুদ্ধিজীবীদের দিকে। তারাও তাকাল তার দিকে।

ভদ্রলোক চিৎকার করে বলল, 'দেখুন মশাই, আপনি নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ব্যবহার করছেন। এটা পড়ার জায়গা, কিন্তু আপনি এটাকে তাড়িখানা বানিয়েছেন। খুশিমতো হৈ-হট্টগোল করছেন, হাত থেকে খবরের কাগজ ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আপনার ব্যবহার অসহ্য। আপনি জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ঝেস্‌তিয়াকভ!'

'তুমি ঝেস্‌তিয়াকভ হও বা যে-ই হও আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোমার এই খবরের কাগজটা সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জান? এই দেখ।'

লোকটি খবরের কাগজটাকে উঁচু করে তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

'এসবের কী মানে মশাইরা!' ঝেস্‌তিয়াকভ বিড়বিড় করে বলতে লাগল, রাগে তার প্রায় বুদ্ধিলোপ হয়ে আসছে, 'এমন অদ্‌ভুত কাণ্ড... যাকে বলে... যাকে বলে... হতভম্ব হয়ে যাওয়া!'

'ও বাবা রাগ করেছেন, দেখছি!' লোকটি হেসে উঠল, 'হায়, আমার কী হবে, ভয় লাগছে যে আমার! দ্যাখ, দ্যাখ, আমার হাঁটুদুটো যে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লেগেছে! যাক্‌ গে, এসব ঠাট্টাতামাসার কথা থাক এখন। শুনুন মশাইরা, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার নেই ... বুঝতেই পারছেন, আমি চাই এখানে বাইরের লোক কেউ না থাকে, মাদ্‌মোয়াজেলদের সঙ্গে একা থাকতে চাই আমি। নিজের ফূর্তিতে থাকতে চাই... কাজেই আপনারা দয়া করে আমাকে ঘাঁটাবেন না, এখান থেকে চলে যান... সামনেই দরজা খোলা আছে। ও মশাই বেলেবুখিন! অমন নাক উঁচু করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কেন? যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোক, বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে! আমার হুকুম... আমি যখন বেরিয়ে যেতে বলি তখন বেরিয়ে যেতেই হবে ... জল্‌দি, নইলে ঘাড় ধাক্‌কা দিয়ে বার করে দেব!'

না। আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, 'বাঃ চমৎকার ... সত্যি! ভাবো তো দেখি!' গ্নেক্কের গম্ভীরভাবে খায়, গুরুগম্ভীর শব্দে বাকচাতুর্য জাহির করে আর অনুকম্পা ও প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে তরুণীদের কথা শোনে। যখন তখন কী খেয়াল চাপে, বিশ্রী ফরাসী ভাষায় কথা বলে ওঠে, আর তারপর কেন জানি না মাঝে মাঝে আমাকে সম্বোধন করে ফরাসী ভাষায় বলে, 'মহামান্য মহাশয়'!

কিন্তু আমি বিষণ্ণ হয়ে উঠি। স্পষ্টতই ওদের উপস্থিতিতে বিব্রত হই, আমার উপস্থিতিতে ওরা হয় বিব্রত। এর আগে কোনো দিন আমার মধ্যে উন্নাসিকতার ভাব জাগেনি, কিন্তু আজকাল এ ধরনের একটা অনুভূতি আমাকে পীড়িত করে। গ্নেক্কেরের মধ্যে যা কিছু খারাপ দিক আছে, শুধু সেগুলোকেই আমি লক্ষ্য করে চলি। এটা করতে বিশেষ সময় লাগে না। তারপর এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকি, একটা উট্‌কো লোক কিনা আমারই বাড়িতে বসে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে! এই লোকটি সামনে থাকলে আরেক দিক থেকেও আমার ওপর খারাপ ফল হয়। সাধারণত আমি যখন একা বা পছন্দমতো সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন নিজের গুণাবলীর কথা মনে পড়ে না, বা যদিও মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে, সেগুলোকে মনে হয় তুচ্ছ — নিজেকে মনে হয় যেন আনকোরা পাশ করা একজন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু গ্নেক্কেরের মতো লোকের সামনে বসে মনে হয় আমার গুণাবলী পর্বতের মতো সুবৃহৎ, আর সেই পর্বতের চূড়া মেঘের রাজ্য ফুঁড়ে আকাশে মিলিয়ে গেছে। সেই পাহাড়ের পাদদেশে গনেক্কেরের মতো লোকেরা ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। তারা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাদের প্রায় চোখেই পড়ে না।

দুপুরের খাওয়ার পরে পড়বার ঘরে গিয়ে পাইপ ধরাই। সারাদিনে এই একবার। আগে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ধূমপান করতাম, কমতে কমতে আজকাল একবারে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে আমার স্ত্রী এসে সামনে বসে এবং নানা কথা বলে। সকালবেলার মতো এবারেও আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি, আমার স্ত্রী কোন্ কথা তুলবে।

'নিকলাই স্তেপানিচ, ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের গুরুতর আলোচনা করতে হবে,' এই বলে ও শুরু করে, 'লিজার কথা বলছি, বুঝতে পারছ তো . যাই বলো বাপু, তোমারও আরেকটু খেয়াল থাকা দরকার...'

'কী বলতে চাও?'

'এমন ভাব দেখাও যেন কিছুই তোমার নজরে পড়ে না। এটা মোটেই ভালো নয়। এভাবে গা ভাসিয়ে চলার কোনো অধিকার নেই তোমার। গ্নেক্কের লিজাকে বিশেষ চোখে দেখে... তুমি কী মনে করো?'

'লোকটা যে অপদার্থ তা বলতে পারি না, কারণ তাকে চিনি না। কিন্তু আমি তো তোমাকে হাজার বার বলেছি যে লোকটাকে পছন্দ করি না।'

'না, না, এমন কথা মুখে এনো না ... কক্ষনো না ...'

অত্যন্ত বিচলিত ভাবে আমার স্ত্রী উঠে দাঁড়ায় এবং ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে। তারপর বলে, 'এমন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে এমন হাল্কাভাবে কথা বলতে তুমি পারলে কী করে? তোমার নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ ও ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কাজেই তোমার ব্যক্তিগত ভালো-লাগা না-লাগার কথা ছেড়ে দিতে হবে। আমি জানি, তুমি ওকে পছন্দ করো না। আচ্ছা বেশ ... মনে করো, আমরা ওকে বলে দিলাম আমাদের মত নেই, এ বিয়ে ভেঙে গেল — তুমি কি বলতে চাও, তারপরেও লিজার মন চিরকালের জন্যে আমাদের ওপরে বিষিয়ে উঠবে না? আর এমন তো নয় যে ঝুড়ি ঝুড়ি লোক এসে লিজাকে বিয়ে করতে চাইছে?! সে দিন আর নেই। এমনও হতে পারে, লিজাকে বিয়ে করতে চায় এমন দ্বিতীয় কোনো লোক কোনো দিনই হাজির হল না ... ছেলেটা লিজাকে খুবই ভালোবাসে আর আমি যতোদূর বুঝতে পারি, লিজাও পছন্দই করে ওকে ... আমি জানি, ওর এখনো কোনো স্থিতি হয়নি কিন্তু তা আর কী করা যাবে। আশা করা যাক, একদিন না একদিন ওর একটা কিছু সুরাহা হবে। ছেলেটি সৎ বংশের, টাকাপয়সাও প্রচুর আছে।'

'এ খবর জানলে কী করে?'

'ও আমাকে বলেছে। খারকভে ওর বাবার প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। কাছাকাছি জমিদারিও আছে নাকি নিকলাই স্তেপানিচ, তোমাকে একবার খারকভে যেতে হবে। বুঝতে পারলে?'

'কী জন্যে?'

'সরেজমিনে খোঁজ নিলে ... ওখানকার কিছু কিছু অধ্যাপকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, তারাই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু হাজার হোক আমি মেয়েলোক। আমি পারি না ...'

রূঢ় স্বরে আমি জবাব দিই, 'আমি খারকভে যেতে পারব না।'

আমার স্ত্রী আতঙ্কে ভেঙে পড়ে, ওর চোখেমুখে ভীষণ একটা যন্ত্রণার ভাব ফুটে ওঠে।

কাঁদতে কাঁদতে ও মিনতি করে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, ঈশ্বরের দোহাই, এই বোঝার ভার থেকে আমাকে রেহাই দাও! এ জ্বালা আমার আর সয় না!'

ওর এই অবস্থা দেখে ব্যথা পাই। দরদভরা স্বরে বলি, 'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন বলছ ভারিয়া, আমি যাব খারকভে। যা বলবে তাই করব।'

আমার কথা শুনে ও চোখে রুমাল চেপে কাঁদবার জন্যে নিজের ঘরে চলে যায়। আমি একা বসে থাকি।

একটু পরেই ঘরে বাতি দিয়ে যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে আর্মচেয়ার আর বাতির ঢাকনার পরিচিত সব ছায়া পড়ে। সেগুলো দেখে দেখে অনেক দিন আগে থেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছি। এই ছায়াগুলো দেখে আমার মনে পড়ে যায় যে রাত্রি আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সেই অভিশপ্ত অনিদ্রারোগ শুরু হয়ে যাবে। একবার বিছানায় শুই, আবার উঠি। ঘরময় পায়চারি করি, আবার যাই বিছানায় ... সাধারণত দুপুরের খাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলা আমার স্নায়বিক উত্তেজনা চরমে ওঠে। বাহ্যত কোনো কারণ না থাকলেও বালিশে মুখ গুঁজে আমি কাঁদতে শুরু করি। আর ঠিক এই রকম সময়ে মনে হয় যে কেউ হয়তো এসে পড়বে, কিংবা আমি হয়তো হঠাৎ মরে যাব। নিজের কান্নায় নিজেরই লজ্জা হতে থাকে আর সব মিলিয়ে আমার অবস্থা বড়ো অসহ্য হয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, আমার ঘরের বাতি, আমার বইপত্র, মেঝের ছায়া — এসবের দিকে আর কিছুতেই তাকাতে পারব না, ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসা মানুষের গলার স্বর কান পেতে কিছুতেই শুনতে পারব না। একটা অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য শক্তি প্রচণ্ড ভাবে ঠেলা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বাইরে বার করে নিয়ে যাচ্ছে যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরি, তারপর বেরিয়ে পড়ি। বেরোবার সময়ে যতো রকম ভাবে সম্ভব সতর্ক হই পাছে বাড়ির কোনো লোক আমাকে দেখে ফেলে। কোথায় যাব আমি?

এ প্রশ্নের জবাব অনেক আগে থেকেই মনের মধ্যে আছে, যাব কাতিয়ার কাছে।

৩

সাধারণত ওকে দেখি, কৌচে বা টার্কিশ সোফায় শুয়ে শুয়ে পড়ছে। আমাকে দেখে ও অলসভাবে মাথা তোলে, উঠে বসে এবং আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্রাম নিয়ে অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি, তারপর বলি, 'আবার শুয়ে আছো? এটা তোমার পক্ষে খুবই খারাপ হচ্ছে কিন্তু। যা হোক কিছু একটা কাজে লেগে যাও না কেন?'

'কি?'

'বলছি কি, তোমার যা হোক কিছু একটা করা উচিত।'

'তা তো বুঝলাম! কিন্তু করব কী? কারখানায় কাজ নেওয়া বা থিয়েটারে নামা — মেয়ের কাছে বাছাই করার কিছু নেই।'

'বেশ তো। কারখানায় কাজ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। না হয় থিয়েটারেই নামলে?'

ও চুপ করে থাকে।

আধা আন্তরিকতার সুরে বলি, 'তুমি বিয়ে করছ না কেন?'

'বিয়ে করবার মতো মানুষ নেই। আর বিয়ে করতেই বা যাব কেন?'

'কিন্তু এভাবে জীবন কাটানোর তো কোনো অর্থ হয় না।'

'স্বামী না থাকার কথা বলছ? তাতে কী যায় আসে? পুরুষের তো আর অভাব নেই? ইচ্ছে করলেই পেতে পারতাম।'

'এসব ভালো নয় কাতিয়া।'

'কী সব?'

'এইমাত্র তুমি যে সব কথা বললে?'

কাতিয়া বুঝতে পারে যে ও আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। ওর কথা শুনে আমার মনে যে খারাপ ধারণা হয়েছে তা খানিকটা কাটিয়ে তোলার জন্যে ও বলে, 'দেখে যাও, এসো আমার সঙ্গে! এসেই দ্যাখ না! এই যে, এদিকে!'

একটা ছোট্ট সুন্দর ঘরে ও আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায় এবং একটা ডেস্কের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'দ্যাখ ... তোমার জন্যে তৈরি রেখেছি।

তুমি এখানে বসে কাজ করবে। তোমার কাগজপত্র নিয়ে রোজ এখানে চলে এসো। ওরা তোমাকে বাড়িতে শান্তিতে কাজ করতে দেয় না। কী বলো, কাজ করবে তো এখানে? বলো, রাজি?'

সরাসরি অস্বীকার করলে হয়তো ওর মনে কষ্ট হতে পারে, তাই ওকে বলি, নিশ্চয়ই এখানে এসে কাজ করব এবং এই ঘরটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে তারপর সেই ছোট্ট সুন্দর ঘরে আমরা দুজনেই বসি এবং গল্প করতে শুরু করি।

উষ্ণ ও আরামপ্রদ পরিবেশ এবং দরদী সঙ্গী পেলে আগে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম। আজকাল আর তা করি না। এখন বরং এই অবস্থায় অভিযোগ ও বিক্ষোভগুলো ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে হতে থাকে, নিজের সম্পর্কে করুণা বোধ করলে এবং নিজের নালিশগুলো জানালে হয়তো খানিকটা সুস্থ বোধ করব।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করি, 'বড়ো বিশ্রী দিনকাল পড়েছে। বড়োই বিশ্রী।'

'কী হয়েছে?'

'শোনো তাহলে ব্যাপারটা। রাজার যে সব বিশেষ ক্ষমতা থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে পবিত্র ক্ষমতা কী? তা হচ্ছে রাজার অধিকার যাকে খুশি ক্ষমা করতে পারেন। এদিক থেকে আমি চিরকাল নিজেকে রাজা বলে মনে করে এসেছি, কারণ যেখানেই সম্ভব হয়েছে এই বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার পুরোপুরি করেছি। ভালো মন্দ ভেবে দেখিনি, সবাইকে প্রশ্রয় দিয়েছি এবং নির্বিচারে ক্ষমা বিতরণ করেছি। যে ব্যাপারে অন্যরা প্রতিবাদ করেছে এবং ফুঁশে উঠেছে, আমি সেখানে উপদেশ দিয়েছি এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছি। সারাটা জীবন কেটেছে শুধু এই চেষ্টায় যে বাড়ির লোকজন ছাত্র, সঙ্গী ও চাকরবাকরের সঙ্গে যেন মানিয়ে চলতে পারি। আর যারাই আমার সংস্পর্শে এসেছে তাদের সকলের ওপরেই আমার এই বিশেষ মনোভাবের প্রভাব পড়েছে জানি, এর অন্যথা হয়নি। কিন্তু এখন আর আমি রাজা নই। এখন আমার মনের ভেতরে যে অবস্থা চলেছে তা একজন ক্রীতদাসের পক্ষেই থাকা সম্ভব: দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে বিষাক্ত সব চিন্তা ওঠে, বুকের মধ্যে এমন সব অনুভূতি বাসা বাঁধে যা আগে কখনো ছিল না। মন ভরে

থাকে ঘৃণায় আর বিদ্বেষে, অবজ্ঞায়, ক্রোধে আর ভয়ে। আমি হয়ে উঠেছি কল্পনাতীত রকমের কঠোর, নির্দয়, কোপন, রূঢ়, সন্দেহপ্রবণ। যে সব ঘটনা আগে গায়ে না মেখে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিতাম, তা দেখে এখন মনে কুটিল সব অনুভূতি জাগে। যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা থাকে না। আগে যে জিনিসটাকে তুচ্ছ মনে করতাম তা টাকাপয়সা, এখন মন বিষিয়ে আছে টাকাপয়সার ওপরে নয়, টাকাপয়সাওলা লোকগুলোর ওপরে। যেন এই লোকগুলোরই যতো দোষ। আগে উৎপীড়ন ও জবরদস্তিকে ঘৃণা করতাম, এখন ঘৃণা করি সেই লোকগুলোকে যারা জবরদস্তি করে। যেন এই লোকগুলোরই যতো দোষ, এই লোকগুলোর জন্যেই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি আনা যাচ্ছে না। এ সবের কী অর্থ হতে পারে? মনে এসব চিন্তা ও অনুভূতি জেগে ওঠার কারণ যদি এই হয় যে আমার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি বদলে গেছে, তাহলে তারই বা কারণ কী? ব্যাপারটা কি এই যে জগৎ সংসার আরো খারাপ হয়েছে আর নিজে আরো ভালো হয়েছি, নাকি এই যে এতকাল অন্ধ ও নিরাসক্ত ছিলাম? তুমি তো জান, আমি রোগে ভুগছি, রোজ শরীরের ওজন কমছে। কাজেই এই পরিবর্তনের কারণ যদি এই হয় যে আমার শরীরের ও মনের ক্ষমতা সাধারণভাবে কমে গেছে — তাহলে বলতে হবে, অবস্থা অতি করুণ। কারণ, তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে আমার সমস্ত চিন্তা অস্বাভাবিক ও অসুস্থ। এজন্যে আমার নিজের লজ্জা পাওয়া উচিত এবং এসব চিন্তাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা উচিত।'

আমার কথার মাঝখানেই কাতিয়া বলে ওঠে, 'এ ব্যাপারের সঙ্গে তোমার অসুখের কোনো সম্পর্ক নেই। এতদিনে তোমার চোখ খুলেছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু নয়। আগে তুমি জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকতে, এখন চোখ মেলে তাকাচ্ছ। আমার মতে, যে কাজটি তোমার প্রথমেই করা উচিত তা হচ্ছে এক্ষুনি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ওদের কাছ থেকে সরে আসা।'

'তুমি যা-তা বলছ কাতিয়া।'

'সত্যি করে বলো তো ওদের তুমি ভালোবাস কিনা? মনকে চোখ ঠেরে লাভ কী? একে কি পরিবার বলে? এমন একদল লোক যাদের থাকা না থাকা সমান! আজ যদি ওরা মরে যায়, কাল কেউ খেয়ালও করবে না ওরা নেই।'

কাতিয়া সম্পর্কে আমার স্ত্রী ও মেয়ের যতোখানি ঘৃণা, ওদের সম্পর্কে কাতিয়ারও ততোখানি অবজ্ঞা। একজন আর একজনকে ঘৃণা করার অধিকার নিয়ে আজকাল কেউই আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু কাতিয়ার মতামতকে গ্রহণ করলে এবং এ ধরনের অধিকারকে স্বীকার করে নিলে, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে আমার স্ত্রী ও লিজাকে অবজ্ঞা করবার যতোখানি অধিকার কাতিয়ার আছে, তেমনি কাতিয়াকে ঘৃণা করবার ততোখানি অধিকার আছে আমার স্ত্রী ও লিজার।

কাতিয়া আবার বলে, 'বাজে লোক! তোমার খাওয়াদাওয়া হয়েছে? অবাক কাণ্ড দেখছি, তোমাকে খেতে ডাকার কথা ওদের মনে ছিল? ব্যাপারটা কী, ওরা যে তোমার অস্তিত্ব এখনো মনে রেখেছে?'

কঠোর স্বরে বলি, 'কাতিয়া, আমি চাই তুমি এ ধরনের কথা এক্ষুনি বন্ধ করো।'

'তুমি কি মনে করো, ওদের কথা মুখে আনতে খুব মজা পাচ্ছি? মন থেকে ওদের কথা একেবারে মুছে ফেলতে পারলেই খুশি হই। কথাটা শোনো, এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাও এখান থেকে। বিদেশে যতো তাড়াতাড়ি যেতে পারো, ততোই ভালো।'

'কী যা তা বলছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের কী হবে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়তে হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে তোমার কী লাভ হয়েছে? কী পেয়েছ তুমি? ত্রিশ বছর ধরে তুমি তো ছাত্র পড়াচ্ছ, কিন্তু কোথায় গেল তারা? তাদের মধ্যে কজনের নাম শোনা যায়? মনে মনে একবার হিসেব করে দ্যাখ তো দেখি? এই ডাক্তারগুলো জানে শুধু লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে আর হাজার হাজার রুবল্ জমাতে। কাজেই এদের গড়ে তোলবার জন্যে তোমার মতো প্রতিভা ও আন্তরিকতার কোনো দরকারই নেই! তুমি না থাকলেও চলবে!'

শিউরে উঠে বলে ফেলি, 'দোহাই তোমার, থাম, কী ভীষণ শক্ত কথাই না তুমি বলতে পার! তুমি না থামলে আমি চলে যাব এখান থেকে। এ ধরনের কথার কোনো জবাব আমার জানা নেই!'

পরিচারিকা এসে খবর দেয় যে চা তৈরি। বলতে আনন্দ হচ্ছে, সামোভারের পাশে এসে বসার পর আমাদের কথাবার্তা অন্য বিষয়ে চলে আসে। মনে যা

কিছু নালিশ জমা ছিল তা প্রকাশ করেছি। এবার ইচ্ছে হচ্ছে, বুড়ো বয়সের আরেকটি দুর্বলতাকে কিছুটা প্রশ্রয় দিই, অর্থাৎ, পুরনো দিনের কথা বলতে শুরু করি। কাতিয়াকে বলি আমার অতীত জীবনের কথা। আর এমন সব ঘটনার কথা বলি যা ভুলেই গিয়েছিলাম বলে আমার ধারণা ছিল। এতদিন পরেও ঘটনাগুলো মনে পড়ছে দেখে অবাক হই। দরদভরা প্রশংসা ও গর্বের সঙ্গে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাতিয়া আমার কথা শোনে। বিশেষ করে ভালো লাগে ওকে আমার ধর্ম স্কুলের কথা বলতে, একদিন আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব সেই স্বপ্নের কথা বলতে।

বলে চলি, 'স্কুলের বাগানে বেড়াতাম। অনেক দূরের কোনো পানশালা থেকে গানবাজনার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসত বাতাসে। কিংবা ঠুন ঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ত্রয়কা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে যেত ধর্ম স্কুলের দেওয়ালের পাশ দিয়ে। আর কিছু চাইতাম না, এতেই আনন্দ উথলিয়ে উঠত, আনন্দে ভরে যেত বুক, শুধু বুক নয় পেট, হাত, পা ... কান পেতে শুনতাম গানবাজনার বা দূরে মিলিয়ে-যাওয়া ঠুন ঠুন ঘণ্টার শব্দ আর কল্পনা করতাম যেন ডাক্তার হয়েছি। কল্পনায় অনেক রঙিন ছবি আঁকতাম, একটার চেয়ে পরেরটা ভালো। আর দ্যাখ, সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে! আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে আমার জীবন। ত্রিশ বছর ধরে জনপ্রিয় অধ্যাপক হয়েছি, চমৎকার সব বন্ধু পেয়েছি, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি। জীবনে প্রেম এসেছে, প্রেমের আবেগে বিয়ে করেছি, আমার ছেলেমেয়ে হয়েছে। এক কথায়, অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় আমার জীবন অতি সুন্দর এক সঙ্গীত, ওস্তাদের সৃষ্টি। আমারই ওপরে নির্ভর করছে এখন সঙ্গীতের শেষ ঝঙ্কারটি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় অর্থাৎ, আমাকে মানুষের মতো মরতে হবে। মৃত্যু যদি সত্যি সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার হয়, তাহলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে মাথা উঁচু করে — আমি যে শিক্ষক, আমি যে বৈজ্ঞানিক, আমি যে এক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের নাগরিক সে গৌরব যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু এই শেষ ঝঙ্কারটিকে নষ্ট করতে বসেছি। যখন ডুবতে চলেছি আর তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি সাহায্যের জন্যে তখন তুমি আমাকে কিনা বলছ: ডোবো, ডুবে যাওয়াই তোমার দরকার।'

হঠাৎ সদর দরজার কলিং-বেল বেজে ওঠে। কাতিয়া আর আমি দ্‌জনেই ব্‌ঝতে পারি, কে এসেছে।

'নিশ্চয়ই মিখাইল ফিওদরভিচ এসেছে,' আমরা বলি।

আর বাস্তবিকই কিছ্‌ক্ষণের মধ্যে এসে ঢোকে আমার ভাষাতত্ত্ববিদ বন্ধ্‌ মিখাইল ফিওদরভিচ। পঞ্চাশ বছর বয়েস, লম্বা ঋজ্‌ চেহারা, ঘন পাকা চুল, কালো ভুর্‌, পরিষ্কার কামানো গাল। মান্‌ষ হিসেবে সে খাঁটি, সহকর্মী হিসেবে চমৎকার। প্রাচীন এক অভিজাত বংশে তার জন্ম, এই বংশের প্রত্যেকেই কম বেশি পরিমাণে সৌভাগ্যবান ও গ্‌ণবান, আমাদের দেশের সাহিত্য শিক্ষার ইতিহাসে প্রত্যেকেরই কিছ্‌ না কিছ্‌ অবদান আছে। সে নিজেও ব্‌দ্ধিমান, প্রতিভাবান, উচ্চশিক্ষিত, তবে, পাগলামি যে একেবারেই নেই তা নয়। আমরা সকলেই কোনো না কোনো ব্যাপারে কিছ্‌টা অদ্‌ভুত। কিন্তু এই লোকটির পাগলামির মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতা আছে যা ওর বন্ধ্‌দের পক্ষেও সময়ে সময়ে হয়তো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ওর বন্ধ্‌দের মধ্যে এমন অনেককে জানি যারা ওর এই পাগলামিকেই বড়ো করে দ্যাখে, ওর অসংখ্য গ্‌ণাবলীকে একেবারেই দেখতে পায় না। ঘরে ঢুকে সে ধীরে ধীরে হাতের দস্তানা খ্‌লে ভারী গলায় বলে, 'শ্‌ভ সন্ধ্যা! চা খাচ্ছেন ব্‌ঝি! চমৎকার! বাইরে কী বিশ্রী ঠাণ্ডা।'

তারপর সে টেবিলের ধারে বসে নিজের জন্যে গ্লাসে চা ঢেলে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে শ্‌র্‌ করে। তার কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য একটা সদা ঠাট্টা তামাসার স্‌র এবং দর্শন ও ভাঁড়ামির অদ্‌ভুত একটা সমন্বয়। শ্‌নে 'হ্যামলেট' নাটকের কবর খননকারীদের কথা মনে পড়ে যায়। কথা বলে সে এমন বিষয়ে যার গ্‌র্‌ত্ব আছে কিন্তু তার কথার মধ্যে কোনো সময়েই গ্‌র্‌ত্ব থাকে না। তার সমালোচনা সদা র্‌ঢ় ও কটু। কিন্তু তার নম্র মস্‌ণ ও হাসিখ্‌শি ব্যবহারের জন্যে এই র্‌ঢ়ভাষা ও কট্‌ক্তির জ্‌বালাটুকু টের পাওয়া যায় না। তার কথার ধরনে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণ্ডা দেড়েক কাহিনী সংগ্রহ করে আনে এবং টেবিলে বসেই সেগ্‌লো বলতে শ্‌র্‌ করে। এ ব্যাপারের অন্যথা হয় না।

কৌতুকের ভঙ্গিতে ভুর্‌দ্‌টোকে বাঁকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'ঈশ্বরের কি লীলা! সংসারে কত অদ্‌ভুত ধরনের লোকই না আছে!'

কাতিয়া বলে, 'কী শুনি!'

'আজ ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় আমাদের সেই হাঁদারাম এন.এন.-এর সঙ্গে দেখা ... যেমন তার অভ্যেস, খুঁজতে বেরিয়েছে — নিজের মাথাব্যথা, বা যে-সব ছাত্র তার ক্লাস থেকে পালিয়ে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে নালিশ জানাতে। ভাবলাম, এই সেরেছে, আমাকে তো দেখে ফেলল, আর নিস্তার নেই ...'

এমনিভাবে সে বলে চলে। কিংবা হয়তো এভাবে শুরু করে:

'গতকাল গিয়েছিলাম আমাদের জেড্-ভায়ার বক্তৃতা শুনতে। অবাক হলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে। ওই লোকটার মতো একটা নপুংসককে কিনা প্রকাশ্য বক্তৃতা সভায় দাঁড় করিয়ে দিলে! সারা ইউরোপের লোক জানে যে লোকটা একটা আস্ত গর্দভ। সারা ইউরোপ ঢুঁড়েও এ রকমটি আর পাওয়া যাবে না। আর বক্তৃতা দেবার ঢং-টাই বা কী! অপরূপ! যেন আম্ আম্ করে মিষ্টি চুষে খাচ্ছে। ব্যস্, তারপরেই ভয়ে ধুকপুক করে, নিজের পাণ্ডুলিপি ভালো করে বুঝতে পারে না (বিশপমশাই সাইকেলে চেপে যেমন পাঁই পাঁই করে ছোটেন এই লোকটির চিন্তার গতি তেমনি)। সবচেয়ে বিশ্রী, ও কী বলতে চায় তা কেউ বুঝতে পারে না। ওর বক্তৃতা শুনে ভীষণ একঘেয়ে লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে কনভোকেশনের বক্তৃতার সঙ্গে শুধু তুলনীয়। এবং এর চেয়ে খারাপ কী হতে পারে?'

এই পর্যন্ত বলে সে আচমকা চলে আসে অন্য কথায়।

'নিকলাই স্তেপানিচের মনে আছে হয়তো যে তিন বছর আগে আমার ওপরে এই বক্তৃতা দেবার ভার পড়েছিল। সে কী অবস্থা আমার! যেমন গরম, তেমনি গুমোট, আর আমার পোশাকী ফ্রককোটটা বগলের তলায় আঁট হয়ে ছিল! তারপর আমি তো বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম ... আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা ... মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম যে আর মাত্র দশটা পৃষ্ঠা বাকি। আর এই দশ পৃষ্ঠার মধ্যেও শেষ চার পৃষ্ঠা একেবারেই অদরকারী, কাজেই বাদ দিলেও চলে। বাকি থাকে ছ'পৃষ্ঠা। মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম। কিন্তু ও হরি, ভাবি এক আর হয় এক! চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, সামনের সারিতে সম্মানচিহ্ন পরা জেনারেল ও এক আর্চবিশপ পাশাপাশি বসে আছে। বেচারাদের কী অবস্থা!

বিরক্তিতে শরীর কাঠ হয়ে রয়েছে, জোর করে চোখ খুলে রাখবার জন্যে অনবরত চোখ পিট পিট করতে হচ্ছে। আবার এমন একটা মুখের ভাব করে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে যেন তারা খুব মন দিয়ে শুনছে, আর আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছে। ওদের এই অবস্থা দেখে ভাবলাম, আচ্ছা, মজা বোঝো বাছাধন, শুনতেই চাও তো শোনো ভালো করে। তারপর আর কি, শেষ চার পৃষ্ঠাও বাদ দিইনি।'

মনে হয় কথা বলার সময়ে শুধু তার চোখ আর ভুরুতে হাসি ফুটে ওঠে; শ্লেষপ্রবণ লোকেরা সাধারণত এমনি ভঙ্গীতে কথা বলে। এ রকম সময় তার চোখে কোনো বিদ্বেষ বা রাগের ভাব থাকে না। শুধু থাকে খানিকটা কৌতুকপ্রিয়তা এবং শৃগালসুলভ ধূর্ততা — যা দেখা যায় একমাত্র সেইসব লোকেরই মুখে যাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আছে। তার চোখের কথা যখন বর্ণনা করছি তখন তার আর একটা বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করি। যখন সে কাতিয়ার হাত থেকে গ্লাস নেয়, বা কাতিয়ার কথা শোনে, বা কাতিয়ার কোনো কারণে একবার ঘরের বাইরে যাবার দরকার হলে সে যেভাবে ওকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে, তখন তার চোখের দৃষ্টিতে আমি লক্ষ্য করি নম্রতা, মিনতি ও সারল্য ফুটে উঠতে।

পরিচারিকা এসে টেবিল থেকে সামোভার সরিয়ে নিয়ে যায় আর সে জায়গায় রেখে যায় মস্ত একটুকরো পনীর, কিছু ফলমূল আর এক বোতল ক্রিমিয়ার শ্যাম্পেন। মদ হিসেবে ক্রিমিয়ার এই শ্যাম্পেনটি উঁচু জাতের নয়, কিন্তু ক্রিমিয়ায় থাকার সময়ে কাতিয়া এই বিশেষ জাতের মদটির প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তাকওয়ালা সেলফ থেকে দু-প্যাকেট তাস বার করে আনে মিখাইল ফিওদরভিচ এবং পেসেন্স খেলতে শুরু করে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে যে কোনো কোনো পেসেন্স খেলায় নাকি বেশ পরিমাণ মনোযোগ ও অভিনিবেশ দরকার হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজে কিন্তু আগাগোড়া খেলার সময়ে কথা বলে চলে। কাতিয়া শুধু তাসগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কথা বিশেষ বলে না, বরং হাত নেড়ে বা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে তাসের চাল বলে দেয়। সারা সন্ধ্যা কাতিয়া মদ খায় ছোট গ্লাসের দু-গ্লাসের বেশি নয়। আমি খাই বড়ো গ্লাসের আধ গ্লাস। বাকিটা মিখাইল ফিওদরভিচের ভাগে পড়ে। এই লোকটি প্রচুর মদ খেতে পারে, কিন্তু মাতাল হয় না।

পেসেন্স খেলার ভেতর দিয়ে আমরা নানা সমস্যার সমাধান করি। সমস্যাগুলো প্রধানত উচ্চতম পর্যায়ের, এবং আমাদের অধিকাংশ শরনিক্ষেপ হয় একটিমাত্র সমস্যাকে লক্ষ্য করে, যা আমাদের সকলের কাছেই সবচেয়ে প্রিয়। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের সমস্যা।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে মিখাইল ফিওদরভিচ কথা বলে: 'ঈশ্বর জানেন, বিজ্ঞানের যুগ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই... মানুষ বুঝতে পারছে যে বিজ্ঞানের জায়গায় এখন অন্য কিছুকে বসানো উচিত। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে অন্ধবিশ্বাসের জমিতে আর বিজ্ঞান বেড়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাসের আবহাওয়ায়। এখন বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাসের সার-নির্যাস, ঠিক যেমনটি হয়েছিল এই বিজ্ঞানের বাতিল হয়ে যাওয়া মাতৃকুল—আল্‌কেমি, তত্ত্ববিজ্ঞান, দর্শন। আসলে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অবদান কতোটুকু? ধরা যাক চীনেদের কথা। চীনেরা কোনো রকম বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এই চীনেদের সঙ্গে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের তফাৎ নিতান্তই বাহ্যিক। চীনেরা বিজ্ঞানের ধার ধারে না কিন্তু তাতে তাদের কী ক্ষতিটা হয়েছে শুনি?'

আমি বলি, 'একটা মাছিও বিজ্ঞানের ধার ধারে না। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'আপনি রাগ করবেন না নিকলাই স্তেপানিচ। অন্য কারও কাছে আমি এ ধরনের কথা বলব না ... আপনি আমাকে যতোটা অসাবধান ভাবছেন আমি তা নই। প্রকাশ্যে এ ধরনের কথা কখনো বলব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। ঈশ্বর করুন, এমন অবস্থা আমার যেন না হয়! সাধারণ মানুষ এই অন্ধবিশ্বাস মনে মনে পোষণ করে যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা হচ্ছে কৃষি ও বাণিজ্যের চেয়েও উ'চুদরের জিনিস, শিল্পের চেয়েও বড়ো। এই অন্ধবিশ্বাস আছে বলেই আমাদের এই গোষ্ঠী টিকে আছে। কাজেই আপনি বা আমি কেন এই অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করব? ঈশ্বর করুন, এমন অবস্থায় যেন আমরা কক্ষনো না পড়ি!'

খেলা চলতে থাকে আর তারই মধ্যে এক সময়ে যুবক সম্প্রদায়কে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি দেওয়া শুরু হয়ে যায়।

মিখাইল ফিওদরভিচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'জনসাধারণের দিন দিন অবনতি ঘটছে। মনে করবেন না, একটা বড়ো আদর্শ বা এ ধরনের কোনো

কিছুর কথা বলছি। তারা শুধু যদি জানতো কী করে কাজ ও চিন্তা করতে হয়! অবস্থা দেখে মনে হয়, কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি—আগামী কালের মানুষদের বিষণ্ণভাবে লক্ষ্য করছি!'

কাতিয়া সায় দেয়, 'সত্যি কথা, মানুষের ভয়ংকর অবনতি ঘটেছে। গত পাঁচ দশ বছরে যতো ছাত্রকে পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে যার নাম বিশেষভাবে করা চলে?'

'অন্য অধ্যাপকদের কথা জানি না। কিন্তু আমার নিজের ছাত্রদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখি না।'

কাতিয়া বলে চলে, 'এককালে আমার সঙ্গে প্রচুর লোকের পরিচয় ছিল। তারা অনেকেই ছাত্র ও তরুণ বৈজ্ঞানিক, অনেকেই অভিনেতা... তাদের সম্পর্কে আমার কী ধারণা জানেন? এমন একজনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি যার সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ হতে পারে। বীর বা প্রতিভাবান মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। সব কিছু যেন নিষ্প্রাণ, মামুলি, ফাঁপা, কৃত্রিম ...'

মানুষের অবনতি সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা শুনে সর্বদাই মনে হয়, যেন ঘটনাচক্রে আচমকা নিজের মেয়ের সম্পর্কে কোনো অপ্রিয় কথা শুনে ফেলেছি। নিতান্ত মামুলি বিষয়ের ভিত্তিতে সবাইকার উপর দোষারোপ করা, অবনতি বা আদর্শের অভাব ইত্যাদি নাম দিয়ে কতকগুলো কল্পিত ভয়কে হাজির করা বা অতীত গৌরবের কথা বলা — এসব আমাকে ব্যথিত করে। অভিযোগ যদি তুলতেই হয়, এমন কি মহিলাদের সামনেও তবে তার ভিত্তিমূলে থাকা উচিত চূড়ান্ত একটা যাথার্থ্য। নইলে অভিযোগ হয়ে ওঠে কুৎসা-রটনা — তার বেশি কিছু নয়, হয়ে ওঠে ভদ্রলোকদের অনুপযুক্ত।

আমি বৃদ্ধ হয়েছি, ত্রিশ বছর আছি আমার কাজে, কিন্তু কোনো অবনতি বা আদর্শের অভাব দেখতে পাই না এবং মনে করি না অতীতের চেয়ে বর্তমান খারাপ। এ বিষয়ে হলঘরের পরিচারক নিকলাইয়ের অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য; সে বলে যে আজকালকার ছাত্ররা আগেকার দিনের ছাত্রদের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই ভালোও নয়, খারাপও নয়।

যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আজকালকার ছাত্রদের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস আছে যা আমি পছন্দ করি না তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জবাব

দিতে পারব না, কিংবা বেশি কিছু বলবো না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে নিশ্চয়ই কথা কইব না। আমার ছাত্রদের দোষত্রুটিগুলো আমার জানা আছে, সুতরাং ভাসা ভাসা কতকগুলো মামুলি কথার আড়ালে আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমার মতে আজকালকার ছাত্রদের এতবেশি ধূমপান ও মদ্যপান করা উচিত নয় এবং এত দেরিতে বিয়ে করা উচিত নয়। আমি পছন্দ করি না তাদের ঢিলেমি ও উদাসীনতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উদাসীনতার ফলে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের অভাবের দিকেও চোখ পড়ে না এবং 'দরিদ্র ছাত্র সাহায্য সমিতির' চাঁদা বাকি থেকে যায়। কোনো বিদেশী ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই, ভুল রুশ ভাষায় তারা বক্তব্য প্রকাশ করে। এই তো গতকালই আমার এক সহযোগী বন্ধু স্বাস্থ্যতত্ত্বের অধ্যাপক বলছিলেন, তাঁকে আগে যতগুলো ক্লাস নিতে হত এখন তার দ্বিগুণসংখ্যক ক্লাস নিতে হয়, কারণ পদার্থবিজ্ঞানে ছাত্ররা দুর্বল এবং মিটিয়ারোলজিতে তারা একেবারেই অজ্ঞ। সর্বাধুনিক লেখকদের নিয়ে তারা অতি সহজেই মাতামাতি করে, এমন কি এই সর্বাধুনিক লেখকরা যদি সেরা লেখক নাও হয় তবুও, কিন্তু শেক্‌সপীয়র, মার্কাস অরেলিয়স, এপিক্‌টেটাস বা পাস্কাল ইত্যাদির চিরায়ত সাহিত্য সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন। বড়ো আর ছোট-র মধ্যে তফাৎ করতে না পারার এই অক্ষমতা থেকেই এসেছে তাদের দৈনন্দিন সাধারণবুদ্ধির অভাব, যা পদে পদে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে কম বেশি সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ জটিল প্রশ্নগুলোর (যেমন স্বদেশত্যাগী চাষীদের জমি বিলিবন্দোবস্ত) সমাধান করবার চেষ্টা তারা করে না। অথচ প্রশ্নগুলো তাদের হাতের কাছেই রয়েছে এবং বৃত্তিগত দিক থেকেও এই প্রশ্নগুলোর সমাধান তাদের করা উচিত। তারা কিন্তু কোনোটাই করে না, তার বদলে বসে বসে শুধু চাঁদার তালিকা তৈরি করে। খুশি হয়েই তারা হাসপাতালের চাকরি নেয়, অধ্যাপকের সহকারী বা ল্যাবরেটরি কর্মচারী বা আবাসিক চিকিৎসক হয়, এবং এ কাজেই জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে খুশি। অথচ মনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতোখানি দরকার তা অন্য কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে, যেমন ধরা যাক কলা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রের চেয়ে, কিছুমাত্র কম দরকারী নয়। আমার ছাত্র ও শিষ্যের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও আমার সহকারী বা উত্তরসাধক

নয়। সুতরাং, ছাত্রদের যদিও আমি ভালোবাসি বা পছন্দ করি কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমার কোনো গর্ব নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

অবশ্য প্রচুর দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তা দেখে শুধু ভীরু আর কাপুরুষরাই হতাশ হয় ও গালিগালাজ দিতে শুরু করে। এই সমস্ত দোষত্রুটি চিরকালের নয়, কতকগুলো আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগের ফল এবং পুরোপুরি ভাবেই পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর স্থায়িত্ব বড়ো জোর দশ বছর, তারপরেই হয়তো অন্য ধরনের নতুন সব দোষত্রুটি দেখা দেবে। তখন আবার সেইসব দোষত্রুটি দেখে আরেক দল দুর্বলচিত্ত আতঙ্কিত হবে। ছাত্রদের পাপাচার দেখে আমি প্রায়ই রুষ্ট হই। কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধরে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের পড়িয়ে, তাদের মেলামেশাকে লক্ষ্য করে এবং বাইরের পৃথিবীর লোকজনের সঙ্গে তাদের তুলনা করে যে আনন্দ পেয়েছি তার কাছে আমার এই রাগ কিছুই নয়।

মিখাইল ফিওদরভিচ উপহাস করে চলে, কাতিয়া শোনে এবং দুজনের কেউ-ই লক্ষ্য করে না যে, সঙ্গীদের সমালোচনা করার মতো এমন বাহ্যত নির্দোষ একটা আনন্দ কোন্ অতল গহ্বরের দিকে তাদের টেনে নিয়ে চলেছে। দুজনের কেউ-ই লক্ষ্য করে না যে সাধারণ কথাবার্তা দিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা ক্রমেই কুৎসিত হতে হতে বিদ্রূপ আর উপহাসে পর্যবসিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই তা কুৎসা-রটনরা পর্যায়ে নেমে গেছে।

মিখাইল ফিওদরভিচ বলে, 'কী সব অপরূপ লোকের সঙ্গেই না রাস্তায় ঘাটে দেখা হয়! কাল গিয়েছিলাম আমাদের ওই ইয়েগর পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে দেখলাম আপনার এক মেডিক্যাল ছাত্র বসে আছে, সম্ভবত থার্ড ইয়ারে পড়ে। মুখখানাকে এমন করে তুলেছে যেন মূর্তিমান দব্লিউবভ, সারা কপালে গভীর ধ্যানের ছাপ। আমাদের মধ্যে দু একটা কথা হল। আমি বললাম, "ওহে ছোকরা, শুনেছ তো, সেদিন কোথায় যেন পড়লাম, কোন্ জার্মান, আমি তার নাম ভুলে গেছি, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ইডিয়োটিন নামে অ্যাল্কালয়েড নিষ্কাশন করেছে!" ওমা, দেখি কি, ছোকরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে। সারা মুখে ভক্তি গদগদ ভাব — বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নেই — এমনি একটা ছাপ ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। আরেকদিন গিয়েছিলাম

থিয়েটার দেখতে। বসে আছি। আর আমার ঠিক সামনেটিতে বসেছে দুটি লোক। একজনকে দেখে মনে হল আইনের ছাত্র, একজন 'কমরেড', অপর জন মেডিক্যাল ছাত্র, বুনো বুনো চেহারা। মেডিক্যাল ছাত্রটি মদে চুর হয়ে আছে। মঞ্চের ওপরে কী ঘটছে বা না ঘটছে সেদিকে একটুও মনোযোগ নেই। বসে বসে শুধু ঢুলছে আর মাথা নাড়ছে। কিন্তু যখনই কোনো অভিনেতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করে বা এমনি কোনো কারণে গলা চড়ায়, আমাদের মেডিক্যাল ছাত্রটি চমকে উঠে পাশের সঙ্গীকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী বলল?, ভাবের কথা নাকি?" আইনের ছাত্রটি জবাব দেয়, "হ্যাঁ, মস্ত ভাবের কথা।" মেডিক্যাল ছাত্রটি চিৎকার করে ওঠে, "সা-আ-আ-বাস! সাবাস ভাবের কথা!" লক্ষ্য করবেন, মাতাল হতচ্ছাড়াটা থিয়েটারে যায় শিল্পের জন্যে নয়। তার ভাবের কথার দরকার!'

কাতিয়া শোনে আর হাসে। ওর হাসির মধ্যে কেমন একটা এলোমেলো ভাব আছে। এক ধরনের দ্রুত আর ছন্দোবদ্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো, যেন ও কন্‌সেটিনা বাজাচ্ছে আর ওর যা কিছু উল্লাস সমস্ত ফুটে উঠেছে ওর নাসারন্ধ্রে। আমি মুষড়ে পড়েছি, কী বলব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমি ফেটে পড়ি, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, আর চিৎকার করে বলি:

'চুপ করো! তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা একজোড়া কোলা ব্যাং, তোমাদের নিশ্বাসে বাতাস বিষিয়ে যাচ্ছে। অনেক কথা বলেছ! আর নয়!'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে পা বাড়াই। ওদের গালগল্প শেষ পর্যন্ত শোনবার ধৈর্য আমার আর নেই। তাছাড়া, বাড়ি যাবার সময়ও হয়েছে। রাত এগারোটা।

মিখাইল ফিওদরভিচ বলে, 'ইয়েকাতেরিনা ভ্লাদিমিরভনা, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি আরেকটু বসি।'

কাতিয়া জবাব দেয়, 'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ। তাহলে দয়া করে আরেক বোতল মদ আনতে বলুন।'

হাতে মোমবাতি নিয়ে দুজনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে হলঘর পর্যন্ত আসে। যতোক্ষণ আমি ওভারকোট পরি, মিখাইল ফিওদরভিচ বলে:

'নিকলাই স্তেপানিচ, কিছুদিন ধরে আপনাকে ভীষণ রোগা আর বুড়োটে দেখাচ্ছে। ব্যাপার কী? আপনার কি অসুখ করেছে?'

'বিশেষ কিছু নয়।'

'তবুও ডাক্তার দেখাবে না।' রুক্ষ স্বরে কাতিয়া বলে ওঠে।

'আপনি কারও সঙ্গে পরামর্শ করেছেন না কেন? এভাবে কতদিন চলবেন আপনি? জানেন তো, উদ্যোগী পুরুষকেই ঈশ্বর সাহায্য করেন। আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি বলে দুঃখিত। তাদের আমার প্রীতি জানাবেন। বিদেশে চলে যাবার আগে একদিন যাব আপনার বাড়িতে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব। যাব নিশ্চয়ই। আগামী সপ্তাহেই রওনা হচ্ছি।'

মনের মধ্যে একটা জ্বালা নিয়ে, আমার অসুখের আলোচনায় আতঙ্কিত হয়ে এবং নিজের ওপরে একটা রাগ পুষে রেখে কাতিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, যাই হোক না কেন, একজন সহকর্মীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে কী এমন ক্ষতি? সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীর অবস্থাটা কল্পনা করে নিতে পারি। তিনি প্রথমে আমাকে পরীক্ষা করবেন, তারপর নিঃশব্দে চলে যাবেন জানলার কাছে, কিছুক্ষণ চিন্তা করবেন, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে এমন একটা মুখের ভাব করবেন যাতে তাঁর মুখ দেখে সত্যি কথাটা বুঝতে না পারি, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি সুরে বলবেন, 'আমি যতোদূর বুঝতে পারছি, বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। তবুও আমার উপদেশ যদি শোনেন তো বলব, আপনি এবার অবসর নিন ...' এবং এই কথার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশা থেকে আমি বঞ্চিত হব।

কোনো রকম আশা পোষণ করে না, এমন লোক আমাদের মধ্যে কে আছে? যতোক্ষণ নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করি এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা করি, ততোক্ষণ মাঝে মাঝে এই আশা থাকে যে আমার অজ্ঞতা হয়তো আমাকে প্রতারিত করেছে এবং কতকগুলো ব্যাপারে আমি ভুল করেছি — যেমন, আমার প্রস্রাবে অ্যাল্‌বুমেন ও শর্করা যেটা আবিষ্কার করেছি, আমার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, আর ইতিমধ্যেই একদিন সকালে দু-দুবার আমার শরীরে যে শোথরোগের লক্ষণ টের পেয়েছিলাম সে সম্বন্ধে। স্নায়বিক রোগাক্রান্ত লোকের মতো উৎসাহ নিয়ে আমি যখন চিকিৎসা পুস্তকের পাতা ওল্টাই, প্রতিদিন বদলাই ওষুধ, তখন ক্রমাগত ভাবি এমন একটা কিছু চোখে পড়বে যাতে সান্ত্বনা পাবো। আগাগোড়া ব্যাপারটা কী তুচ্ছ!

আকাশ মেঘে ঢাকা থাক্ বা আকাশে চাঁদ ও তারা ফুটে উঠুক,

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, আমার জীবনে কত শীঘ্রই না মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। মনে হতে পারে, এই অবস্থায় আমার চিন্তাও হয়ে ওঠে আকাশের মতোই প্রগাঢ়, প্রত্যক্ষ ও গভীর... কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হয় না। ভাবি নিজের কথা, আমার স্ত্রী, লিজা, গ্নেকের ও ছাত্রদের কথা, এক কথায়, সমস্ত মানুষের কথা। অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর চিন্তা আমার, নিজেই নিজেকে চোখ ঠেরে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করি। জীবন সম্পর্কে আমি যে মনোভাব সব সময়ে পোষণ করি তা বোঝানো যেতে পারে স্বনামখ্যাত আরাক্‌চেয়েভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আরাক্‌চেয়েভ লিখেছিলেন, 'সংসারে যা কিছু ভালো আছে, তার মধ্যে খানিকটা মন্দ থাকবেই, আর সব সময়েই দেখা যায় যে ভালোর চেয়ে মন্দেরই প্রাধান্য বেশি।' অন্য কথায়—সব কিছুই ঘৃণাজনক, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, এবং আমার জীবনের যে বাষট্টিটা বছর কেটে গেছে তা ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। এই ধরনের চিন্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমি সজাগ হয়ে উঠি এবং নিজেই নিজেকে বোঝাই যে এই চিন্তাগুলো নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, আমার সত্তার গভীরে এসব চিন্তার কোনো গভীর মূল নেই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবি, 'তাই যদি হবে তবে রোজ রাত্রে ওই কোলা ব্যাঙদুটোর কাছে যাও কেন?'

তখন নিজের মনে মনেই প্রতিজ্ঞা করি যে আর কোনো দিন কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব না। কিন্তু যতোই প্রতিজ্ঞা করি না কেন, খুব ভালো করেই জানি যে ঠিক পরের দিনই আবার কাতিয়ার বাড়িতে যাব।

যখন সদর দরজার কলিং-বেল টিপি এবং ওপরে উঠে যাই তখন মনে হতে থাকে, আমার পরিবার পরিজন বলতে কেউ নেই, এবং পরিবার পরিজনকে ফিরে পাবার ইচ্ছেও নেই আমার। স্পষ্টই আরাক্‌চেয়েভের উক্তির মধ্যে যে নতুন চিন্তার ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলো আমার সত্তার মধ্যে আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী নয়, সেগুলো শাসন করছে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে। বিবেক আমাকে পীড়িত করে, আমি যন্ত্রণা ভোগ করি, শরীর অসাড় হয়ে আসে, হাত পা নাড়তে পারি না। যেন সাতাশমণী একটা বোঝা আমার ওপরে চেপে বসেছে। এই অবস্থায় বিছানায় গিয়ে শুই এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি।

তারপর সেই ঘুমের শেষে আছে... অনিদ্রারোগ...

৪

গ্রীষ্মকাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধারা বদলে যায়।

একদিন চমৎকার এক সকালে লিজা আমার ঘরে ঢুকে উচ্ছল সুরে বলে, 'হুজুর, আসুন! সব তৈরি।'

তারপর হুজুরকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ওঠান হয় একটা ভাড়া গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করে। গাড়িতে বসে বসে আমি অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আর রাস্তার বিজ্ঞাপনগুলো উলটো দিক থেকে পড়ে যাই। এক জায়গায় লেখা আছে—'ত্রাক্‌তির' (পানশালা)। শব্দটাকে আমি উলটো দিক থেকে পড়ি—'রতিক্‌ত্রা'। এটা কোনো ব্যারনেসের চমৎকার নাম হতে পারে—ব্যারনেস রতিক্‌ত্রা। শহরের বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ার পরে আমরা একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাই। কবরখানাটাকে দেখেও মনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় না, যদিও অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাকে এখানে এসে স্থান নিতে হবে। একটা বনের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়, তারপর আবার উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চল। কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না। ঘণ্টা দুয়েক গাড়ি চলার পরে 'হুজুর' এসে হাজির হন এক গ্রীষ্মাবাসের সামনে, তাঁর জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হয় নিচের তলার একটি ঘরে, নীল দেওয়াল-কাগজ-মোড়া ছোট্ট ঝলমলে ঘরটি।

রাত্রি কাটে যথারীতি অনিদ্রারোগে। কিন্তু সকালবেলা বিছানাতেই শুয়ে থাকি, জেগে উঠে অন্য দিনের মতো আমার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে হয় না। ঠিক যে ঘুমিয়ে থাকি তা নয়, কেমন যেন একটা অর্ধঅচেতন তন্দ্রার ভাব; ঠিক ঘুম নয় অথচ স্বপ্ন দেখাও চলে। দুপুরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠি এবং নিতান্ত অভ্যাসবশেই গিয়ে বসি আমার ডেস্কের সামনে। যদিও কোনো কাজ করি না, কিন্তু বসে বসে কাতিয়ার পাঠানো হলদে মলাটের ফরাসী উপন্যাসের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাই। অবশ্য আমি যদি রুশ লেখকদের লেখা পড়তাম তাহলে আরো বেশি দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হত। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে রুশ লেখকদের লেখা আমার তেমন পছন্দ

নয়। কয়েকজন সর্বজনস্বীকৃত সেরা লেখকদের রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, আধুনিক সাহিত্য আমার কাছে সাহিত্য বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় আধুনিক সাহিত্য যেন এক ধরনের কুটির-শিল্প, এই কুটির-শিল্পটি বেঁচে আছে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের মৌন সম্মতির ওপরে ভিত্তি করে। কুটির-শিল্পজাত সামগ্রী সহজে বিকোয় না। কুটির শিল্পজাত সামগ্রী যতো ভালোই হোক না কেন, তাকে অনবদ্য আখ্যা কিছুতেই দেওয়া চলে না এবং মন খুলে প্রশংসাও করা যায় না—একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। গত দশ পনেরো বছরে আমি যে কটি নতুন ধরনের সাহিত্য পড়েছি, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। একটি বইও উল্লেখযোগ্য নয়, আর সেই 'কিন্তু' শব্দটিও থেকেই যায়। যেমন, 'দক্ষ, ভাবসমৃদ্ধ, কিন্তু খুব চমৎকার নয়; খুব চমৎকার, ভাবসমৃদ্ধ, কিন্তু দক্ষ নয়, কিংবা, সব শেষে—খুব চমৎকার, দক্ষ, কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ নয়।'

তার মানে এই নয় যে ফরাসী বইমাত্রই আমার কাছে খুব চমৎকার, দক্ষ ও ভাবসমৃদ্ধ। ফরাসী বই পড়েও আমি খুশি হই না। কিন্তু রুশ বইয়ের মতো ফরাসী বই নীরস নয় এবং মোটামুটি সমস্ত ফরাসী বইতেই একটা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ আছে, যাকে বলা যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। রুশ লেখকদের মধ্যে এই গুণটি অবর্তমান। সাম্প্রতিক কালে লেখা এমন একটি বইয়ের নামও আমার মনে পড়ে না, যে-বইয়ে লেখক একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই প্রচলিত রীতি ও আপোস-নীতির আড়ালে গা বাঁচাতে চেষ্টা করেনি। কোনো লেখক হয়তো উলঙ্গ দেহের উল্লেখ করতে ভয় পায়, কারুর হাত পা বাঁধা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কেউ হয়তো 'মানবজাতির প্রতি আবেগোক্ত মনোভাবকে' আঁকড়ে ধরে আছে, আরেকজন ইচ্ছে করেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিসর্গ-বর্ণনা দিয়ে চলে যাতে কারও সন্দেহ না হয় যে তার 'বিশেষ কোনো পক্ষপাত' আছে... কেউ চায় যেন-তেন প্রকারে নিজেকে আসল পেটি বুর্জোয়া বলে ফুটিয়ে তুলতে, কেউ চায় আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে, এবং এমনি কত কি। অর্থাৎ, লেখার মধ্যে কারিকুরি আছে, সতর্কতা আছে, অবহিত দৃষ্টি আছে কিন্তু খুশিমতো লেখার নেই স্বাধীনতা, নেই সাহস সুতরাং মৌলিকতার অভাব থেকে যায়। তথাকথিত রম্যরচনা সম্বন্ধেও এ-সব কথা খাটে।

রুশ লেখকদের লেখা চিন্তাশীল প্রবন্ধের কথা যদি ওঠে—যেমন ধরা যাক, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, বা এ-ধরনের কোনো বিষয়ের ওপরে প্রবন্ধ—তাহলে আমি ভয় পাই এবং নিছক ভয় থেকেই তা পড়ি না। ছেলেবেলায় এবং তরুণ বয়সে দু-ধরনের লোককে ভয় করতাম -হলঘরের পরিচারক এবং প্রেক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক। এই ভয় এখনো থেকে গেছে। লোকে বলে, যা আমরা বুঝি না, তাই নিয়েই আমাদের ভয়। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কেন হলঘরের পরিচারক ও প্রেক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়কদের এতবেশি ঠাটঠমক, এমন ঔদ্ধত্য, এমন রাজোচিত মেজাজ। যখন চিন্তাশীল প্রবন্ধ পড়ি তখন ঠিক এমনি ধরনের একটা অস্পষ্ট ভয় আমাকে পেয়ে বসে। এই সমস্ত প্রবন্ধের অনন্যসাধারণ ঠাটঠমক, হিমালয় সমান বাচালতা, বিদেশী গ্রন্থকারদের নিয়ে এমন অনায়াস নাড়াচাড়া, কোনো কিছু মালমশলা ছাড়াই এমন উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে মস্ত একটা কিছু গড়ে তোলার ক্ষমতা—এসবের মর্ম বুঝি না এবং এতে আতঙ্কিত হই। আমি অভ্যস্ত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লেখার সঙ্গে, যার মধ্যে আছে একটা বিনীত ও ভদ্রোচিত সুর। চিকিৎসক ও প্রাণিতত্ত্ববিদ গ্রন্থকারদের রচনাবলী যখন পড়ি, তখন লেখার এই বিশেষ সুরের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটে। চিন্তাশীল রুশ লেখকদের মৌলিক রচনা পড়া আমার পক্ষে যেমন কষ্টকর, তেমনি কষ্টকর তাদের অনূদিত বা সম্পাদিত লেখা পড়া। এই শেষোক্ত ধরনের লেখায় থাকে পিঠ-চাপড়ানো দম্ভের সুরভরা একটি ভূমিকা এবং অজস্র অনুবাদকের টীকা—এই দুটি জিনিস থাকার জন্যে মূল পাঠে আমি মনঃসংযোগ করতে পারি না। তাছাড়া গোটা প্রবন্ধে বা বইয়ে ছড়ানো-ছিটনো থাকে প্রশ্নচিহ্ন ও sic চিহ্ন। চিহ্নগুলোর প্রত্যেকটিকে আমার মনে হয় গ্রন্থকারের স্বাতন্ত্র্যের ওপরে এবং পাঠক হিসেবে আমার স্বাধীনতার ওপরে অসংখ্য আক্রমণ।

একবার আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল জেলা আদালতে বিশেষজ্ঞের মতামত দেবার জন্যে। বিরতির সময়ে আমার একজন সহযোগী বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞেস করলেন, আসামীদের মধ্যে দুজন শিক্ষিতা মহিলা থাকা সত্ত্বেও সরকারী উকিল আসামীদের সঙ্গে যে ধরনের রূঢ় ব্যবহার করেছে, তা আমি লক্ষ্য করেছি কিনা। তাঁকে বলেছিলাম যে চিন্তাশীল প্রবন্ধের লেখকরা একজন আরেকজনের লেখা সম্পর্কে যতোখানি রূঢ়, সরকারী উকিলের রূঢ়তা তার

চেয়ে বেশি কিছুতেই নয়। আমি মনে করি না যে আমার এই মন্তব্যের মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি আছে। সত্যি কথা বলতে কি, লেখকদের মধ্যে এই রূঢ়তা এতবেশি প্রকট যে এ-সম্পর্কে কথা বলতে গেলে মনের স্থৈর্য বজায় রাখা চলে না। একজন লেখক আরেকজন লেখকের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করে বা একজন লেখক আরেকজন লেখকের লেখাকে যে-ভাবে সমালোচনা করে, তার মধ্যে থাকে একটা বাড়াবাড়ি রকমের শ্রদ্ধা যা প্রায় দাসত্বেরই নামান্তর কিংবা একেবারে বিপরীত ধরনের কথা, আমি আমার ভাবিষ্যৎ জামাতা সম্পর্কে এই ডায়েরিতে যে-সব কথা লিখেছি বা মনে মনে যে ধারণা পোষণ করি, তার চেয়েও অনেক বেশি শক্ত কথা সেগুলো। সচরাচর দেখা যায়, চিন্তাশীল প্রবন্ধের ভূষণ হচ্ছে বাতুলতা, উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা এমন কি সব ধরনের অপরাধ। আর এ সমস্ত কিছুকেই উপস্থিত করা হয় চরম যুক্তি হিসেবে—আমাদের অল্পবয়স্ক ডাক্তাররা 'প্রবন্ধ' লিখতে বসে যেমনটি করে। এই মনোভাব দেশের তরুণ লেখকদের নীতিবোধকে প্রভাবিত না করে পারে না। সুতরাং আমি বিন্দুমাত্র অবাক হই না যখন দেখি, গত দশ বা পনেরো বছরে উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা হিসেবে যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতে নায়করা বড়ো বেশি ভদ্‌কা খায়, নায়িকারা যথেষ্ট অকলঙ্ক নয়।

ফরাসী উপন্যাস পড়তে পড়তে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। আমার বাড়ির সামনের দিকে বাগান, বাগানের চারদিকে খুঁটি দেওয়া বেড়া, জানলা দিয়ে তাকিয়ে খুঁটির মাথাগুলোকে দেখি, আর দেখি দু-তিনটে মরা মরা গাছ, বেড়া পেরিয়ে খোলা মাঠ, মাঠের শেষে পাইনগাছের নিবিড় সারি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, সোনালী চুলওয়ালা ও ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে আর আমার টাকমাথার দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসছে। ওদের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, ওরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে। ওরা যেন বলতে চায়: 'ওরে দ্যাখ্, দ্যাখ্, টেকো লোকটার কান্ড দ্যাখ্!' আমার খ্যাতি ও পদাধিকার সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই,এদিক থেকে ওরা প্রায় অনন্য।

আজকাল দর্শনার্থীরা রোজ আসে না। আমি শুধু নিকলাই ও পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচের কথা বলব। নিকলাই সাধারণত দেখা করতে আসে ছুটির দিনে। একটা কিছু দরকারী কাজ সারবার উপলক্ষেই আসে বটে কিন্তু মুখ্য

উদ্দেশ্য থাকে আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া। মদে ওর বড়ো বেশি বেসামাল অবস্থা। এ রকম অবস্থায় শীতকালে ওকে কক্ষনো দেখা যায় না।

ওকে দেখে বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, 'তারপর, খবর কী, সব ভালো তো?'

'হুজুর,' বুকের ওপরে হাত রেখে এবং প্রেমিকের মতো গদগদ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'হুজুর, ভগবান আমার সাক্ষী! ভগবানের শাস্তি যেন মাথা পেতে নিতে হয়! যৌবনে ফুর্তি করব!'

এই বলে সে আবেগের সঙ্গে আমার কাঁধে, জামার আস্তিনে এবং কোটের বোতামের ওপরে চুম্বন করতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'ওখানকার সব খবর ভালো তো?'

'হুজুর, ভগবান সাক্ষী...'

এমনিভাবে ভগবানের দোহাই পেড়ে অনবরত কথা বলে চলে। শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন ওকে পাঠিয়ে দিই রান্নাঘরের দিকে, ওখানে গেলে ওকে খাবার দেওয়া হবে। পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচও আসে ছুটির দিনে। উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। উদ্দেশ্যটা আমাকে দেখা আর কোনো কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করা। সাধারণত সে টেবিলের কাছে বসে। লোকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; পায়ের ওপরে পা তুলে বসার বা টেবিলের ওপরে দু হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ার সাহস তার নেই। কথা বলে অবিশ্রান্ত; নম্র চৌরস গলার স্বর, পুঁথিগত মার্জিত ভাষা। বিভিন্ন পত্রিকা ও বই থেকে সে যে-সব রসালো খবর সংগ্রহ করেছে এবং যেগুলোকে মনে করেছে খুবই চিত্তাকর্ষক, সেগুলো আমায় বলে। এ সমস্ত টুকরো খবর সবই হুবহু একরকম, সবই এক ধরনের। যেমন, ফ্রান্সের কে একজন কী একটা আবিষ্কার করেছে, অন্য একজন — এক জার্মান, প্রমাণ করেছে যে ব্যাপারটা ভুয়ো, অনেক আগে ১৮৭০ সালেই একজন আমেরিকান এই আবিষ্কারটি করেছিল, তৃতীয় আরেকজন লোক সেও জার্মান, দুজনকেই বোকা বানিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে আগাগোড়া ব্যাপারটাই ভ্রান্তিবিলাস, ওরা দুজনেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যা দেখেছে তা বাতাসের বুদ্বুদ, কিন্তু ওরা দুজনেই ধরে নিয়েছে যে জিনিসটা গাঢ় রঞ্জক। এমন কি, আমাকে খানিকটা আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে

যখন সে কথা বলে তখনো এইভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসবের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। তার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন সে একটা থিসিসের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করছে। খবরগুলো সে কোন্ কোন্ পত্রিকা ও বই থেকে সংগ্রহ করেছে তার একটা দীর্ঘ তালিকা পেশ করে, আপ্রাণ চেষ্টা করে, যেন তারিখ বা পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা থেকে সে খবরগুলো সংগ্রহ করেছে সেই সংখ্যাটি বা নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে কোনো রকম ভুল না হয়। নাম বলতে গিয়ে পুরো নামটি বলে—যেমন, কক্ষনো বলবে না পেতি, বলবে জ্যাঁ জ্যাক পেতি—এ দিকে তার খুবই সতর্কতা। মাঝে মাঝে এখানেই খেয়ে যায়। আর খেতে বসেও আগাগোড়া সময়ে তার মুখে সেই এক কথা। শুনতে শুনতে আমাদের এত বিরক্তি ধরে যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠি। গ্নেক্কের বা লিজা যদি কখনো অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলে যেমন, সঙ্গীতের কোনো বিশেষ রীতিনীতির কথা বা ব্রাহ্‌ম্‌স, বা বাক্-এর কথা, তাহলে সে অকপটভাবেই অবাক হয় আর মাথা নিচু করে থাকে। এই ভেবে সে লজ্জা পায় যে আমার মতো বা তার মতো গুরুগম্ভীর লোক যেখানে বসে আছে সেখানে কিনা এত তুচ্ছ সব বিষয়ের অবতারণা!

আজকাল মনের যা অবস্থা তাতে যদি মিনিট পাঁচেক সময়ও এই লোকটির সঙ্গে আমাকে থাকতে হয় তাহলে মনে হয় যেন যুগ যুগ ধরে এই লোকটিকে দেখছি বা এই লোকটির কথা শুনছি। বেচারাকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ওর নম্র চৌরস গলা, পুঁথিগত মার্জিত ভাষা, আর বিচিত্র সব কাহিনী শুনলেই ভীষণভাবে দমে যাই, মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ও আমার কাছে আসে খুব বেশি রকমের সহানুভূতি ও দরদের মনোভাব নিয়ে। কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য আমি যেন একটু আনন্দ পাই। এসবের পুরস্কার হিসেবে শুধু ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, যেন ওকে সম্মোহিত করতে চাইছি আর তা করতে গিয়ে নিজের মনেই বারবার বলছি, 'যাও, যাও, যাও...' কিন্তু যতোই বলি না কেন, ওর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, ও নড়ে না, নড়ে না, নড়ে না...

যতোক্ষণ ওকে আমার সামনে থাকতে দেখি, ততোক্ষণ কিছুতেই মন থেকে এই চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে পারি না: আমি মরে গেলে খুব সম্ভব এই লোকটিই আমার জায়গায় কাজ করবে। সঙ্গে সঙ্গে হৃতগৌরব ক্লাসঘরের

ছবিটা মরূদ্যানের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যেখানকার সমস্ত জলধারা গেছে শুকিয়ে। তখন পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচের ওপরে মন বিরূপ হয়ে ওঠে, চুপ করে থাকি, দুর্ব্যবহার করি। ভাবখানা এমন যেন আমার মনের এসব চিন্তার জন্যে ওই লোকটিই দায়ী, আমি নই। ও যখন যথারীতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, আমি আর তখন ওর কথার জবাবে ঠাট্টাতামাসাটুকুও করতে পারি না, বিমর্ষ মনে বিড়বিড় করে বলি, 'তোমার এই জার্মানগুলো হচ্ছে এক দঙ্গল গাধা...'

বুঝতে পারছি, আমার আচরণটা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা সেই পরলোকগত অধ্যাপক নিকিতা ক্রিলভের মতো। তিনি একবার রেভাল্-এ স্নান করছিলেন, সঙ্গে ছিলেন পিরগোভ। স্নান করতে গিয়ে যেই দেখলেন জলটা ঠান্ডা, অমনি ভীষণ চটে বলে উঠলেন,' 'এই হতচ্ছাড়া জার্মানগুলোর জ্বালায় আর পারা গেল না!' পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচের সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করি। কিন্তু যখন ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমার চোখে পড়ে, বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে আর ওর মাথার টুপিটা এক-একবার বেড়ার ওপরে ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে, তখন ভয়ানক একটা ইচ্ছে হয় যে ওকে ডেকে পাঠাই আর বলি, 'মাপ কোরো ভাই!'

দুপুরের খাওয়া শীতকালে যতোটা না বিরক্তিকর ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। আজকাল প্রায় রোজই সেই গ্নেক্কের লোকটা আমাদের সঙ্গে খায়। লোকটাকে এখন দু-চোখে দেখতে পারি না, রীতিমতো ঘৃণা করি। আগে লোকটার উপস্থিতি চুপ করে সহ্য করতাম। এখন আমার ক্ষুরধার বুদ্ধির সমস্ত তীর ওকে লক্ষ্য করেই নিক্ষেপ করি। আমার আচরণ দেখে আমার স্ত্রী ও লিজা দুজনেই লজ্জা পায়। মাঝে মাঝে রাগে এমন গা জ্বালা করে যে একেবারে উদ্ভট সব কথা বলতে শুরু করি। কেন যে বলি তা নিজেই জানি না। যেমন ধরা যাক একদিনের কথা। বিদ্বেষ-ভরা দৃষ্টিতে গ্নেক্কেরের দিকে তাকিয়ে সেদিন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলেছিলাম:

মুর্গি-ছানার চাইতে নিচে উড়তে পারে ঈগল,
আকাশ ছুঁতে মুর্গি ছানা হবে না কিন্তু সফল।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই মুর্গির ছানা গ্নেক্কের ঈগল অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ও ভালো করেই জানে যে আমার স্ত্রী ও কন্যা ওর পক্ষে; কাজেই ও এই কৌশল ধরে চলে: আমি যতোই ঠাট্টাবিদ্রুপ করি না কেন, ও প্রশ্রয় দেবার মতো মুখের ভাব করে চুপচাপ থাকে (ভাবটা এই যে বুড়ো লোকটার বকবক করা স্বভাব, কাজেই তর্ক না করাই ভালো), কিংবা ভালোমানুষি ভাব দেখিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। মানুষ যে কত নীচ হতে পারে তা দেখে অবাক হতে হয়। আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তবুও খেতে বসে সারাক্ষণ দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকতে পারি, কল্পনা করি, গ্নেক্কের যে একটা ঠগ্ তা সবাই জেনে ফেলেছে, আমার স্ত্রী ও লিজা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে আর আমি ওদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করছি।

যে-সব ঘটনা ঘটে বলে আগে লোকের মুখে শুনতাম তা এখন নিজের চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি। এসব ঘটনা আমার কাছে যদিও খুব যন্ত্রণার ব্যাপার কিন্তু তবুও একটি ঘটনার কথা বলব। ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েক দিন আগে খাওয়াদাওয়ার পরে।

সেদিন আমার ঘরে বসে আছি, বসে বসে পাইপ টানছি, এমন সময়ে রোজকার মতো আমার স্ত্রী এসে ঢোকে আমার ঘরে, আমার সামনে বসে, তারপর বলে যে গরম থাকতে থাকতেই এবং আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই আমি যদি খারকভ যাই তাহলে খুবই ভালো হয়, আর খারকভে গিয়ে আমাকে খোঁজ নিতে হবে আমাদের এই গ্নেক্কের লোকটি সত্যি সত্যিই কী দরের লোক।

'বেশ, ঠিক আছে, যাব।' রাজী হয়ে যাই।

শুনে আমার স্ত্রী খুবই খুশি হয়, তারপর ঘরের বাইরে যেতে যেতে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে:

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি জানি কথাটা শুনলেই তোমার মেজাজ খারাপ হবে। কিন্তু তবুও বলব। তোমাকে সাবধান করাটা আমার কর্তব্য... নিকলাই স্তেপানিচ, আমার দোষ নিও না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কাতিয়ার কাছে তোমার ঘন ঘন যাতায়াতটা পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব সবার চোখে পড়তে শুরু করেছে। কাতিয়া বুদ্ধিমতী, অনেক লেখাপড়া শিখেছে, সঙ্গিনী

হিসেবেও চমৎকার — সবই ঠিক। কিন্তু তোমার যা বয়েস এবং সমাজে তোমার যা প্রতিষ্ঠা তাতে তুমি যদি এখন সঙ্গসুখ পাবার জন্যে ওর কাছে গিয়ে বসে থাক, সেটা খুব ভালো দেখায় না… তাছাড়া, ওর কান্ডকারখানা কে না জানে!'

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিন্ডে গিয়ে জড়ো হয়, দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে থাকে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, তারপর মেঝের ওপরে পা দাপাতে দাপাতে রগ দুটো চেপে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি:

'সরে যাও! সরে যাও আমার সামনে থেকে! একা থাকতে দাও আমাকে!'

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, গলার স্বর নিশ্চয়ই হয়ে উঠেছিল, খুব অস্বাভাবিক, কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, দিগিবদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেও তারস্বরে আর্ত চিৎকার করে ওঠে। আমাদের চিৎকার শুনে ছুটে এসে হাজির হয় লিজা ও গুনেক্কের, পেছনে পেছনে ইয়েগর …

আমি আবার বলি, 'সরে যাও! সরে যাও আমার সামনে থেকে! একা থাকতে দাও আমাকে!'

আমার পা দুটো একেবারে অবশ হয়ে যায়, মনে হতে থাকে পা দুটোর কোনো অস্তিত্বই নেই, আমি পড়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারি কে যেন আমাকে ধরে ফেলে, অস্পষ্টভাবে শুনি কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারপরে মূর্ছা যাই, দু-তিন ঘন্টার আগে জ্ঞান হয় না।

কাতিয়ার কথায় ফিরে আসা যাক। রোজ ঠিক সন্ধ্যে হবার আগে ও আসে আমার কাছে। কাজেই এ-ব্যাপারটা বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শীদের চোখে না পড়ে পারে না। ও আসে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে, আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। নিজের ঘোড়া আছে ওর, আর এই গ্রীষ্মে একটা নতুন 'বারুশ' গাড়ি কিনেছে। সব মিলিয়ে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই আছে ও। মস্ত বাগানওলা এক ব্যয়বহুল গ্রীষ্মাবাস ভাড়া নিয়েছে শহরের বাইরে। সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে এসেছে পুরনো বাড়ি থেকে। দুজন ঝি ও একজন সহিস রেখেছে। আমি প্রায়ই ওকে জিজ্ঞেস করি, 'বাপের রেখে যাওয়া টাকা খরচ হয়ে যাবার পরে তুমি কী করবে, কাতিয়া?'

'সে দেখা যাবে,' কাতিয়া জবাব দেয়।

'আরেকটু বুঝেশুনে তোমার টাকা খরচ করা উচিত। তোমার বাবার কত কষ্টের জমানো টাকা!'

'তা জানি। একথা তুমি আমাকে আগেও বলেছ।'

আমাদের গাড়ি প্রথমে চলে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, তারপর পাইনবনের ভেতর দিয়ে, যে পাইনবনকে আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য এখনো আমাকে মুগ্ধ করে, যদিও কে যেন আমার কানে কানে বলে যায় যে এই পাইন ও ফার-গাছ, এই পাখি আর আকাশের এই সাদা মেঘ — সবই এমনি থাকবে, কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যে যখন মরে যাব তখন আমার কথা কেউ মনে রাখবে না। ঘোড়ার লাগাম ধরতে কাতিয়া ভালোবাসে। আবহাওয়াটা ভালো, আর আমি ওর পাশটিতে বসে আছি — সব মিলিয়ে ও খুশি হয়ে ওঠে। মনে মনে ওর খুবই আনন্দ হয়, কথার মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা থাকে না।

ও বলে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, লোক হিসেবে তুমি খুবই ভালো। তোমার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না। কোনো অভিনেতার সাধ্য নেই তোমাকে অভিনয়ের মধ্যে মূর্ত করে তোলে। আমাকে বা মিখাইল ফিওদরভিচকে যে-কোনো নিচু দরের অভিনেতাও মূর্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু তোমাকে মূর্ত করতে কেউ পারবে না। তোমাকে আমার হিংসে হয়, ভয়ানক হিংসে হয়। কিন্তু নিজেকে আমি কী মনে করি? আমি কে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবে, তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, নিকলাই স্তেপানিচ, আমি অবাঞ্ছিত ধরনের মানুষ — তাই না?'

'তাই বটে।'

'তাহলে... তাহলে কী করি বলো তো?'

কী জবাব দেব ওকে? আমি বলতে পারি, 'কাজ করো' বা 'তোমার যা কিছু আছে গরীবদের দিয়ে দাও' বা 'নিজেকে জানো'। এসব কথা বলা খুবই সহজ, আর সহজ বলেই জবাবে আমি ওকে একটিও কথা বলতে পারি না।

আমার চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ সহকর্মীরা ছাত্রদের বলে যে চিকিৎসা করার সময় প্রথমে 'প্রত্যেকটি রোগীকে আলাদা করে নেবে'। এই উপদেশ মেনে নিয়ে স্বতন্ত্র করবার চেষ্টা করলেই টের পাওয়া যায়, চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ মান হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে যে সব প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে তা কী অকিঞ্চিৎকর।

তেমনি শরীরের অসুখ না হয়ে যদি মনের অসুখ হয় তাহলে ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়ায়।

যাই হোক, কাতিয়াকে কিছু বলা দরকার। সুতরাং আমি বলি:

'তোমার ব্যাপারটা কী জান? তোমার হাতে এখন অঢেল সময়। তোমাকে যা হোক কিছু একটা করতে হবে। আচ্ছা, তুমি আবার মঞ্চেই ফিরে যেতে পারো তো? অভিনয় করাটাই তো তোমার বৃত্তি।'

'না, ফিরে যেতে পারি না।'

'এমনভাবে কথা বলছ যেন সর্বস্ব দান করে বসে আছ, নয় কি? এভাবে কথা বললে আমার ভালো লাগে না। আসলে দোষ তোমার নিজের। কিন্তু মনে আছে তো, গোড়ার দিকে তুমি শুধু মানুষ আর সমাজের খুঁত খুঁজে বেড়াতে। মানুষ আর সমাজকে নিখুঁত করে তোলার জন্যে তুমি কিছুই করোনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারনি তুমি। নিজেকে ক্লান্ত করে তুলেছ শুধু। তোমার হার হয়েছে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নয়, তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কাছে। কিন্তু তখন তোমার বয়েস কম ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু এখন হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াবে। আরেকবার চেষ্টা করে দ্যাখ দিকি — আবার তুমি কাজ করবে, আবার তুমি শিল্পের গৌরবময় উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করবে ...'

আমাকে বাধা দিয়ে কাতিয়া বলে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, ভণ্ডামি কোরো না! চিরকালের জন্য একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করে নেওয়া যাক: আমরা কথা বলব অভিনেতা-অভিনেত্রী আর লেখকদের সম্পর্কে। কিন্তু শিল্পকে রেহাই দাও। মানুষ হিসেবে তুমি চমৎকার, তোমার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু শিল্প সম্পর্কে তোমার এমন কিছু জ্ঞান নেই যাতে স্থির বিশ্বাস নিয়ে তাকে তুমি পবিত্র বলতে পারো। আসলে শিল্পের সমঝদার তুমি নও, শিল্পবোধ তোমার নেই। সারা জীবন তোমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলে, কাজেই শিল্পের সমঝদার হবার মতো অবসর তোমার হয়নি। আর তাই পুরোপুরি ভাবেই ... দূর, শিল্প নিয়ে এসব কথা আমার ভালো লাগে না!..' ওর গলার স্বরে আক্রোশ ফেটে পড়ে, 'গা জ্বালা করে আমার! এমনিতেই সবাই শিল্পকে যথেষ্ট খেলো করেছে, সব দিক থেকেই!'

'শিল্পকে কে খেলো করেছে?'

'কেউ কেউ খেলো করেছে একটানা মদ খেয়ে, কাগজওয়ালারা খেলো করেছে ছ্যাবলামি করে, পণ্ডিতরা খেলো করেছে দার্শনিকতা করে।'

'দর্শনের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আছে বৈকি। কোনো লোক যখন দার্শনিকতা করতে শুরু করে তখন বোঝা যায় যে সে কিছুই জানে না।'

কথাবার্তা ক্রমেই কটু মন্তব্যের দিকে যাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করি, তারপর বহুক্ষণ কোনো কথাই বলি না। বন থেকে বেরিয়ে গাড়ি কাতিয়ার বাড়ির দিকে চলতে শুরু করলে আমি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবং বলি:

কিন্তু কেন তুমি মঞ্চে ফিরে যেতে চাও না সে-কথা তো আমাকে বললে না?'

'নিকলাই স্তেপানিচ, মানুষের সহ্যক্ষমতারও একটা সীমা আছে!' চিৎকার করে বলে ও, আর হঠাৎ ওর সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'তুমি কি চাও, যা সত্যি তাকে আমি প্রকাশ করে বলি? বেশ তাই হোক, তাই তো তুমি চাও। কথাটা কী জান, আমার প্রতিভা নেই! কোনো প্রতিভাই নেই ... আছে শুধু দেমাক, শুনলে তো!'

এই স্বীকারোক্তি করার পরেও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওর হাতের কাঁপুনিকে চাপা দেবার জন্যে প্রচণ্ড জোরে লাগাম আঁকড়ে ধরে।

কাতিয়ার গ্রীষ্মাবাসের কাছাকাছি যখন গাড়ি এসে পৌঁছয় তখন দূরে থেকেই আমরা দেখতে পাই, মিখাইল ফিওদরভিচ সদরের সামনে পায়চারি করছে। অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

বিরক্তিভরা স্বরে কাতিয়া বলে, 'আবার সেই মিখাইল ফিওদরভিচ! ওকে যে করে হোক আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ও সামনে থাকলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি। ওর মধ্যে পদার্থ বলে কিছু নেই, একেবারে একটা শুকনো কাঠি। দেখে দেখে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে!'

মিখাইল ফিওদরভিচের বহু আগেই বিদেশে যাবার কথা। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাত্রার দিন পিছিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে লক্ষ্য করা যায়। মুখটা ঝুলে পড়েছে, আর আগে যা কোনো দিন ওর মধ্যে দেখা যায়নি আজকাল তাই হয় — মদ খেয়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। চোখের কালো ভুরুতে পাক ধরেছে। সদরের সামনে গাড়িটা

এসে যখন থামে তখন ও আর নিজের আনন্দ ও অস্থিরতা চেপে রাখতে পারে না। কাতিয়াকে ও আমাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে একটা হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়ে বসে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, হাসে আর হাত কচ্‌লায়। আগে দেখতাম, শুধু ওর চোখের দৃষ্টিতে নম্র বিনীত ও নিরীহ একটি ভাব, এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে ওর সর্ব অবয়বে। ওর খুবই আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের আনন্দের জন্যে লজ্জা পায়, লজ্জা পায় প্রতি সন্ধ্যায় কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বলে, মনে মনে ভাবে, এভাবে ওর দেখা করতে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে কিছু একটা বলা দরকার, আর যা-ই বলুক না কেন তা যে কত উদ্‌ভট তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। যেমন ও বলে, 'একটা দরকারী কাজে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল কয়েক মিনিটের জন্যে একটু দেখা করে যাই।'

আমরা তিনজনেই বাড়ির মধ্যে ঢুকি। প্রথমে আমরা চা খাই, তারপর এতদিন ধরে যে-সব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছি সেগুলো একে একে টেবিলের ওপরে হাজির হতে থাকে। জিনিসগুলো হচ্ছে—দু-প্যাকেট তাস, মস্ত একদলা পনীর, ফল আর ক্রিমিয়ার শ্যাম্পেনের বোতল। আমরা যে-সব বিষয়ে কথাবার্তা বলি সেগুলোও নতুন নয়। শীতকালে যা আলোচনা করেছি এখনো তাই। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যার্থী, সাহিত্য, মঞ্চ — সব কিছুকেই একে একে নস্যাৎ করে ফেলা হয়। কুৎসাপূর্ণ গালগপ্পে আবহাওয়া ঘোলাটে ও বদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু তফাৎ এই যে, গত শীতে ছিল দুটো বুনো ব্যাঙ, এবারে তিনটে, আর তাদের নিশ্বাসে বাতাস বিষিয়ে উঠছে। আজকাল যে পরিচারিকা আমাদের পরিবেশন করতে আসে সে আগেকার মতোই যেমন শোনে মখমলের মতো নরম আর গভীর হাসি, একর্ডিয়ন বাজনার মতো দমকা হাসি, তেমনি শোনে মঞ্চের কমিক জেনারেলদের মতো ভাঙা ভাঙা স্বরের বিশ্রী হাসি।

৫

মাঝে মাঝে এক-একটি রাত্রি আসে যা বজ্রে বিদ্যুতে আর অজস্র বৃষ্টিপাতে ভয়ংকর। রুশদেশের গ্রামের লোকেরা বলে, 'চড়ুইপাখিদের রাত'। এমনি একটি রাত্রি একবার আমার জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধ্যরাত্রি পার হতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। লাফিয়ে নেমে এসেছিলাম বিছানা থেকে। কী করে জানি আমার মাথার মধ্যে এমনি একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু হবে। কেন এই ধারণা এসেছিল? আমার শরীরের মধ্যে এমন কোনো অনুভূতি ছিল না যা থেকে মনে হতে পারত, আমার মৃত্যু আসন্ন। শুধু ছিল একটা আতঙ্ক — যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশের গায়ে মস্ত একটা অশুভ ঝলক চোখে পড়েছে আমার।

তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে নিলাম। টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল তুলে নিয়ে জল খেলাম খানিকটা, তারপর ছুটে গেলাম খোলা জানলার দিকে। ভারি সুন্দর রাত, বাতাসে নতুন-কাটা খড়ের সুবাস আর কিসের যেন মিষ্টি গন্ধ। খুঁটি দেওয়া বেড়ার ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি জানলার ধারে গজিয়ে-ওঠা রুগ্ন গাছগুলোর ঝিমধরা চুড়ো, পথ, বনের গাঢ় রেখা। নির্মেঘ আকাশ, প্রশান্ত উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে চাঁদ জ্বলছে। গাছের পাতায় এতটুকু কম্পন নেই। মনে হতে লাগল, সবকিছু যেন উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, প্রতীক্ষা করছে আমার মৃত্যুর মুহূর্তটির জন্যে ...

চারদিকে ভীষণ এক অশুভ ইঙ্গিত। জানলা বন্ধ করে আবার ছুটে এলাম বিছানায়। চেষ্টা করলাম নিজের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে। কব্জিতে নাড়ীর স্পন্দন না পেয়ে রগের চারদিকে হাতড়াতে লাগলাম, সেখানেও না পেয়ে চিবুকের নিচে, আবার কব্জিতে। সারা শরীর ঘামে ঠান্ডা চটচটে হয়ে গেছে। আমার নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুততর হয়ে উঠল। সারা শরীরটা কাঁপছে। শরীরের ভেতরে সবকিছু চঞ্চল হয়ে উঠে মনে হতে লাগল, আমার মুখ এবং মাথার টাক-পড়া অংশটুকু মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে।

কী করতে পারি আমি? বাড়ির লোকজনকে ডাকব? না, কক্ষনো না। আমার স্ত্রী বা লিজা যদি আসেও তো কতটুকু তারা করতে পারে আমার জন্যে?

চোখ ঢেকে বালিশের তলায় মাথা লুকিয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম . পিঠটা হিম হয়ে গেছে, আমার শিরদাঁড়াকে ভেতর থেকে চুষছে কে যেন। মনে হতে লাগল, অনিবার্য মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে আমার পেছন থেকে ...

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে একটা শব্দ উঠল। কী-ভী, কী-ভী! বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে এই শব্দ আসছে, আমার বুকের ভেতর থেকে না বাইরে থেকে।

'কী-ভী, কী-ভী!'

ঈশ্বর, এ কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! আরেক ঢোক জল খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু চোখ খুলতে বা বালিশ থেকে মাথা তুলতে ভয় পাচ্ছি আমি। যেন একটা বোবা জান্তব যন্ত্রণা গ্রাস করেছে আমাকে, বুঝতে পারছি না কেন এই ভয়। আরো বেঁচে থাকতে চাই — এজন্যে? নাকি একটা নতুন অজানা যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে?

ওপরতলার ঘরে কে যেন গোঙাচ্ছে, কিংবা হয়তো হাসছে ... আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন দ্রুত পায়ে নেমে আসছে। আবার তর তর করে ওপরে উঠে গেল। আবার শোনা গেল নেমে আসার শব্দ। কে যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর কান পেতে শুনছে।

'কে? কে?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

দরজা খুলে গেল। সাহসে ভর করে চোখ খুলে ফেললাম। আমার স্ত্রী। ওর মুখটা ফ্যাকাশে, কান্নায় চোখ লাল।

'তুমি কি জেগে আছ?' ও জিজ্ঞেস করল।

'কেন, কী হয়েছে?'

'দোহাই তোমার। একবারটি এসে লিজাকে দেখে যাও। ওর বড়ো ভয়ানক অবস্থা ...'

'এক্ষুনি যাচ্ছি।' বিড়বিড় করে বললাম। আর একা থাকতে হবে না, এইটুকু ভেবেই খুশি: 'একটু দাঁড়াও ... এই এলাম বলে।'

আমার স্ত্রীর পেছনে পেছনে আমি চললাম, স্ত্রী আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে আর আমি শুনছি। কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে রয়েছি যে ওর কথাগুলো বুঝতে পারছি না। ওর হাতে মোমবাতি, মোমবাতির আলো সিঁড়ির ওপরে নাচানাচি করছে। লম্বা ছায়া পড়েছে আমাদের দুজনের, ছায়াদুটো কাঁপছে। ড্রেসিং গাউনের ঝুলঅংশে পা আটকে গিয়ে আমি প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি। মনে হচ্ছে, কে যেন পেছন থেকে তাড়া

করেছে আমাকে, কে যেন পেছন থেকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। মনে মনে বললাম, 'এই মুহূর্তেই, এই সিঁড়ির ওপরেই মৃত্যু হবে আমার ... আর দেরি নেই ' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিঁড়িটা শেষ হল। তারপরে অন্ধকার বারান্দা, বারান্দার শেষে ইতালীয় ধরনের একটা চওড়া জানলা। বারান্দা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম লিজার শোবার ঘরের দিকে। বিছানার ধারে জুতো খুলে পা ঝুলিয়ে লিজা বসে আছে, পরনে একটা শেমিজ ছাড়া আর কিছু নেই, কাঁদছে।

মোমবাতির দিকে চোখ পিটপিট করতে করতে লিজা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'হা ভগবান, আর পারি না আমি, আর পারি না ...'

আমি বললাম, 'লিজা, সোনা, কী হয়েছে তোমার?'

আমাকে দেখে লিজা চিৎকার করে উঠল, তারপর জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বাবা গো ... বাবা আমার ...লক্ষ্মী সোনা বাবা ... কি জানি কী হল আমার ... কিছু ভালো লাগছে না আমার ...'

দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেল ও। ছোট বয়সে ওর মুখ থেকে যে সব আদরের কথা শুনতাম, সেইসব আদরের কথা বলতে লাগল আমাকে।

বললাম, 'শান্ত হও! ভগবান আছেন! কেঁদো না! আমারও কষ্ট হচ্ছে।'

ওকে আড়াল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। আমার স্ত্রী কী যেন পান করতে দিল ওকে। বিছানার চারদিকে এলোপাথারি ঘুরে বেড়ালাম দুজনে। আমার কাঁধের সঙ্গে ওর কাঁধের ঘষা লাগতে লাগল। মনে পড়ল সেইসব দিনের কথা যখন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে স্নান করিয়ে দিতাম।

'মেয়েটাকে সাহায্য করো। কিছু একটা করো, কিছু একটা করো!' আমার স্ত্রী কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

কিন্তু আমি কী করতে পারি? কিছু করার নেই আমার। মেয়েটার মনের ওপরে একটা কিছু ভার চেপে আছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা নেই, আমি কিছুই জানি না। আর কিছু করতে না পেরে বিড়বিড় করে শুধু বলতে লাগলাম, 'কেঁদো না, কেঁদো না ... সব ঠিক হয়ে যাবে ... এবার একটু ঘুমোও ...'

বাইরে কোথা থেকে একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। কুকুরটা

প্রথমে ডাকছিল নরম সুরে এবং থেমে থেমে, তারপরে গলা চড়িয়ে। গলার স্বর প্রথমে ছিল ধারালো সরু, তারপরে হয়ে উঠল গমগমে মোটা। কুকুরের ডাক বা পেঁচার চিৎকার বা এ ধরনের কিছুতে যে অশুভ কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে তা আগে কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু এবারে আমার বুকের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে, কুকুরের ডাকের কারণটা নিজেই নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলাম।

নিজেকে বললাম, 'দূর! দূর! এ হচ্ছে একজনের ওপরে আরেকজনের প্রভাব, তা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মধ্যে ভয়ানক একটা স্নায়বিক উত্তেজনা ছিল — সেটাই সংক্রামিত হয়েছে আমার স্ত্রীর মধ্যে, লিজার মধ্যে, কুকুরটার মধ্যে। এই হচ্ছে আসল কথা ... এ-ধরনের সংক্রমণের মধ্যেই অমঙ্গলাশঙ্কা, স্বপ্ন, ইত্যাদির আসল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ...'

অল্প কিছুক্ষণ পরে লিজার জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে আমি যখন নিজের ঘরে ফিরে আসি তখন আর নিজের আকস্মিক মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম না। এত মুষড়ে পড়েছি, এত বেশি বিশ্রী লাগছে যে এই মুহূর্তে মরে যেতে পারলেই ভালো হোতো। ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, লিজাকে কী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওপরের ঘর থেকে গোঙানি আর শোনা যাচ্ছে না। তখন ঠিক করলাম যে লিজাকে আর কোনো ওষুধ দেবার দরকার নেই। তারপরেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ...

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। কোনো কোনো লেখকের ভাষায় — এমন নিস্তব্ধতা যে কান ঝাঁ ঝাঁ করে। ধীরে ধীরে সময় পার হয়ে চলল। জানলার শার্সির ওপরে চাঁদের আলোর টুকরোটাকে দেখে মনে হয়, ওটার আর কোনো নড়চড় নেই ... ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।

হঠাৎ সদর থেকে গেট খোলার কিঁচ কিঁচ শব্দ শোনা গেল। কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। মরা একটা গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল লোকটি, তারপর খুব সাবধানে সেই ডাল দিয়ে জানলার শার্সিতে টোকা দিতে লাগল।

শুনলাম চাপা স্বরে কে যেন ডাকছে, 'নিকলাই স্তেপানিচ! নিকলাই স্তেপানিচ!'

জানলাটা খুলে তাকিয়ে মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। জানলার ঠিক নিচেই দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্ত্রীলোক। তার পরনের কালো পোশাক চাঁদের আলোয় চক্‌চক করছে। বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। চাঁদের আলোয় তার মুখটাকে দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে, থমথমে আর অবাস্তব — যেন পাথর কুঁদে তৈরি, আর চিবুকটা কাঁপছে থরথর করে।

সে বলল, 'আমি ... আমি কাতিয়া!'

চাঁদের আলোয় সব মেয়েরই চোখকে বড়ো বড়ো আর কালো কালো দেখায়, সব লোকেই হয়ে ওঠে আরো লম্বা এবং আরো ফ্যাকাশে। বোধ হয় এজন্যেই আমি ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি।

'ব্যাপার কী?'

ও বলল, 'আমার ওপরে রাগ কোরো না। হঠাৎ কেন জানি ভারি বিশ্রী লাগছিল। অসহ্য মনে হওয়াতে গাড়িতে চেপে এখানে চলে এসেছি... দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম, ডেকেই দেখা যাক না ... কিছু মনে কোরো না ... আমার যে কী খারাপ লাগছিল তা যদি জানতে! আচ্ছা, তুমি এখন কী করছিলে?'

'কিচ্ছু না... ঘুম আসছিল না ...'

'আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, কিছু একটা অমঙ্গলের ব্যাপার ঘটবে। অবিশ্যি এসব ভাবনার কোনো অর্থ হয় না।'

ভুরু উঁচিয়ে ও তাকিয়ে রইল। চোখদুটো জলে চকচক করছে। উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে সারা মুখ, যেন উজ্জ্বল কোনো আলো পড়েছে মুখে। সব মিলিয়ে সেই পুরনো দিনের মতো একটা অন্ধবিশ্বাসের ছাপ ওর মুখে। এমনটি আমি বহুদিন দেখিনি।

'নিকলাই স্তেপানিচ,' আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে ও মিনতি করতে লাগল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যদি তুমি আমাকে সত্যিকারের আপনজন বলে ভাবো ও সম্মান করো তাহলে আমার একটি কথা রাখতে হবে ...'

'কী কথা?'

'আমার যা টাকা আছে সব তুমি নিয়ে নাও!'

'এসব কী পাগলামি ঢুকেছে তোমার মাথায়? তোমার টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

'টাকাটা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও। চিকিৎসা করাও নিজের। তোমার চিকিৎসা দরকার। নেবে তো? নেবে তো টাকাটা? নাও না!'

আগ্রহভরা চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ও বলল, 'নেবে তো? একবার বলো নেবে।'

বললাম, 'না, আমি নেব না। তুমি আমাকে টাকা দিতে চাইছ এতেই খুশি।'

আমার দিকে পেছন ফিরে মাথা নিচু করে ও দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত টাকাটা নিতে অস্বীকার করে এমন স্বরে কথা বলেছি যে তারপরে আর টাকার প্রসঙ্গ তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

বললাম, 'বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল দেখা হবে।'

ক্লিষ্টস্বরে ও বলল, 'তাহলে তুমি আমাকে আপনজন বলে মনে করো না!'

'আমি তো তা বলিনি। কিন্তু এখন তোমার টাকায় আমার কোনো লাভ নেই।'

'ঠিক আছে, মাপ করো আমাকে,' গলার স্বর একেবারে নিচু পর্দায় নামিয়ে ও বলল, 'আমি বুঝতে পারছি ... আমার কাছ থেকে তুমি টাকা নেবে কেন? এককালে আমি অভিনেত্রী ছিলাম, এই তো আমার পরিচয় ... আচ্ছা, চলি।'

এই বলে এত তাড়াতাড়ি ও চলে গেল যে বিদায় জানাবার অবসরটুকুও পেলাম না।

৬

আমি খারকভে এসেছি।

আমার মনের বর্তমান অবস্থায় কিছু করার চেষ্টা করা বা লড়াই করতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তেমন ক্ষমতাও আমার নেই। ঠিক করলাম এই পৃথিবীতে জীবনের শেষ কটা দিন এমনভাবে চলব যেন কারও কিছু বলার না থাকে, অন্তত বাইরের চালচলনের দিক থেকে। ভালো করেই জানি, বাড়ির

লোকজনের কাছে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তা হতে পারিনি। তাই অন্তত ওরা যা চায় তাই করব। যদি খারকভে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে খারকভেই যাব। তাছাড়া, হালে সবতাতেই এমন নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছি যে কোথাও যাওয়া-আসার ব্যাপারে আমার কিছু যায় আসে না, তা সে খারকভেই হোক বা প্যারিসেই হোক বা বের্দিচেভেই হোক।

দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছেছি। উঠেছি গির্জার কাছাকাছি একটা হোটেলে। যতোক্ষণ চলন্ত ট্রেনে ছিলাম ততোক্ষণ অসুস্থ মনে হচ্ছিল নিজেকে। কামরার মধ্যে বাতাস বইছিল এলোমেলো। এখন আমি বসে আছি বিছানার ধারটিতে, আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরেছি। অপেক্ষা করছি কখন মুখের মাংসপেশীর মধ্যে দপ্‌দপানি শুরু হবে। আমার উচিত এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া, এখানকার পরিচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার নেই, সে সামর্থ্যও নেই।

বুড়ো ওয়েটার খোঁজ নিতে আসে আমি সঙ্গে বিছানার চাদর এনেছি কিনা। ওকে মিনিট পাঁচেক আটকে রাখি, এবং যেজন্যে আমি এখানে এসেছি, অর্থাৎ গ্নেক্কের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। ভাগ্যক্রমে লোকটি এই খারকভ শহরেরই বাসিন্দা, শহরের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। কিন্তু এ শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে গ্নেক্কের নামে কেউ আছে বলে তার স্মরণে আসে না। আশেপাশের জমিদারি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়েও তার কাছ থেকে সেই একই জবাব পাওয়া গেল।

বারান্দার ঘড়িতে একটা বাজে, তারপর দুটো, তিনটে ... বসে বসে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে জীবনের এই যে শেষ কটি মাস কাটছে এই সময়টুকু কী দীর্ঘ! আমার এতদিনকার মোট জীবনের চেয়েও দীর্ঘ বলে মনে হয়। আগে কখনো সময়ের মন্থর গতি এমন ধৈর্য ধরে সহ্য করিনি। আগে স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে বা পরীক্ষার সময় বসে থাকতে হলে পনেরো মিনিট সময়কেও মনে হত যেন অনন্তকাল। আর এখন এই বিছানার ধারটিতে সারা রাত আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারি এবং এমনি ঔদাস্যের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি যে আগামী কাল বা তার পরের দিনেও রাত্রি হবে এমনি দীর্ঘ ও ঘটনাশূন্য ...

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজে ... ছ'টা ... সাতটা ... রাত্রি আসছে।

গালে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। এবার সেই দপ্‌দেপানি শুরু হবে। যা হোক কিছু একটা চিন্তা করবার জন্যে পুরনো দিনের চিন্তাধারায় ফিরে গেলাম — জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠবার আগে যে সব চিন্তা আমি করতাম। নিজেকেই প্রশ্ন করি: আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং প্রিভি কাউন্সিলর, আমি কেন হোটেলের এই ছোট্ট কামরায় এমন একটা অদ্‌ভুত ছাইরঙা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানার ধারটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছি? কেন তাকিয়ে আছি শস্তা লোহার ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডটার দিকে? কেন কান পেতে শুনছি বারান্দার ঘড়ির টিক টিক শব্দ? আমার মতো বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই কি উপযুক্ত কাজ? এসব প্রশ্নের জবাবে মুখটা বিদ্রূপে কুঁচকে যায়। মনে পড়ে, অল্প বয়সে কী অকপট সারল্যেই না বিশ্বাস করতাম যে বিখ্যাত হতে পারার মতো বড়ো কাজ আর নেই, বিখ্যাত ব্যক্তিদের কী অসামান্য প্রতিষ্ঠা! আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। 'নিভা' ও বিশ্ব-সচিত্র' পত্রিকায় আমার ফটো ছাপা হয়েছে। একটি জার্মান পত্রিকায় সত্যি সত্যিই নিজের জীবনী নিজে পাঠ করেছি। কিন্তু এতসব কাণ্ডের ফল কী হয়েছে। এই তো আমি এক অদ্‌ভুত শহরে এক অদ্‌ভুত বিছানার ওপরে একা একা বসে আছি, আমার গালের মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হচ্ছে আর বসে বসে হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষছি... পারিবারিক বিপর্যয়, পাওনাদারদের নির্মমতা, রেলওয়ে কর্মচারীদের নির্দয় ব্যবহার, পাসপোর্ট ব্যবস্থার অসুবিধে, স্টেশনের খাবার-ঘরে চড়া দাম ও অস্বাস্থ্যকর খাবার, চারদিকের অজ্ঞতা ও রূঢ়তা, এবং আরো অনেক কিছু যা বলতে গেলে মস্ত লম্বা একটি ফিরিস্তি দিতে হয় — এসব ব্যাপারে আমি যতোখানি নাড়া খাই তেমনি নাড়া খায় নিতান্ত মামুলি একজন লোক যাকে পাড়ার বাইরে কেউ চেনে না। তাহলে আমি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার বিশেষত্বটুকু কোথায়? মনে করা যাক, পৃথিবীতে আমার মতো বিখ্যাত আর কেউ নেই, আমি এমন সব বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছি যা নিয়ে আমার দেশ গর্ব করতে পারে, সমস্ত খবরের কাগজে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুলেটিন প্রকাশিত হয়, প্রত্যেকটি ডাকে আমার কাছে আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে, ছাত্রদের কাছ থেকে, ও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক চিঠি আসে। তবুও এতসব কাণ্ডের পরেও আমার মৃত্যু হতে পারে অপরিচিত পরিবেশে বিষণ্ণতার মধ্যে ও

সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায়, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না ... একথা ঠিক যে এজন্যে কারুর ওপরে দোষ চাপানো চলবে না। আমার নিতান্তই পাপ মন, তাই জনপ্রিয়তা পছন্দ নয়। মনে হয়, জনপ্রিয় হতে গিয়ে মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে পড়ে গেছি।

রাত দশটার কাছাকাছি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার গালের মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও গাঢ় ঘুম এলো। কেউ না তুললে হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমতে পারতাম। একটার একটু পরেই দরজায় টোকা দেবার শব্দ শোনা গেল।

'কে?'

'টেলিগ্রাম।'

'টেলিগ্রামটা কি সকাল পর্যন্ত রেখে দেওয়া চলত না?' পোর্টারের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে রাগত স্বরে বললাম, 'এখন আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।'

'মাপ করবেন। আপনার ঘরের আলো জ্বলছিল। ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো জেগে আছেন।'

টেলিগ্রামটা খুলে প্রেরকের নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। টেলিগ্রাম করেছে আমার স্ত্রী। ব্যাপারটা কী?

'গতকাল গুনেক্কের ও লিজা গোপনে বিয়ে করেছে। ফিরে এসো।'

টেলিগ্রামটা পড়ে মুহূর্তের জন্যে একটা আতঙ্ক হল। আতঙ্ক এই ভেবে ততোটা নয় যে গুনেক্কের ও লিজা গোপনে বিয়ে করেছে, আতঙ্ক এজন্যে যে ওদের বিয়ের খবর শুনেও আমি নির্বিকার রয়েছি। লোকে বলে, দার্শনিক ও সাধুরাই নাকি নির্বিকার হতে পারে। কথাটা ঠিক নয়। নির্বিকারত্ব হচ্ছে অসাড় আত্মার লক্ষণ, অকাল মৃত্যুর লক্ষণ!

আবার বিছানায় শুয়ে যা হোক কিছু ভেবে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলাম। কী ভাবব আমি? মনে হতে লাগল, সবকিছু ভাবা হয়ে গেছে, এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমার কৌতূহল জাগ্রত হতে পারে।

যখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল তখন বিছানায় উঠে বসলাম এবং দু হাতে হাঁটু বেড় দিয়ে বসে থাকতে থাকতে আর কিছু করবার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। নিজেকে চেনো — এই

উপদেশটি খুবই চমৎকার, খুবই কাজের। কিন্তু এই উপদেশটিকে কী ভাবে মেনে চলতে হবে সেই নির্দেশটি দিতে প্রাচীনরা ভুলে গেছেন।

আগে আগে যখন নিজেকে বা অন্য কাউকে বোঝবার ইচ্ছে হত তখন আমি মনোযোগ নিবদ্ধ করতাম কাজের দিকে নয়, কারণ কাজের উপর ব্যক্তিবিশেষের হাত নেই, মনোযোগ নিবদ্ধ করতাম আকাংক্ষার ওপরে। একজন মানুষের আকাংক্ষা কী, সেটুকু জানতে পারলেই বলে দেওয়া যায় মানুষটি কী রকম।

তারপর নিজেই নিজেকে জেরা করলাম: কী আমার আকাংক্ষা?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্ররা যদি আমাদের ভালোবাসে, সাধারণ মানুষ হিসেবে ভালোবাসে, আমাদের খ্যাতিকে নয় বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা ছাপকে নয়, তাহলে আমি খুশি হই। আর কী? জনকয়েক সহকারী ও শিষ্য পেলে আমি খুশি হই। আর কী? আজ থেকে একশো বছর পরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে চোখ মেলে দেখবার, শুধু একবার চোখের দেখা দেখার সুযোগ যদি পাই তাহলে খুশি হই। আরো দশ বছর পরমায়ু লাভ করলে আমি খুশি হই... আর কী?

আর কিছু নয়। অনেক ভেবেও আর কিছু মনে পড়ল না। তবে যতোই ভাবি না কেন এবং আমার চিন্তা যতোই দূরপ্রসারী হোক না কেন, একথাটা আমার কাছে পরিষ্কার যে আমার আকাংক্ষার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। অভাব রয়ে গেছে এমন কিছুর যা না থাকলে চলে না, যা আসল জিনিস। এই যে বিজ্ঞানের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, আমার আরো বেঁচে থাকার ইচ্ছে, এক অপরিচিত শয্যায় এভাবে আমার বসে থাকা, নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা, আমার এ সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। এবং নেই বলেই সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিকতায় গাঁথা হয়ে ওঠেনি। আমার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো ছাড়া ছাড়া। বিজ্ঞান, মঞ্চ ও সাহিত্যের সমালোচনা যেভাবে করি, আমার ছাত্রদের সম্পর্কে যে ধরনের কথা বলি, কল্পনায় যে সব ছবি আঁকি তার মধ্যে দক্ষতম মনোবিজ্ঞানীও এমন কিছু খুঁজে পাবেন না যাকে বলা চলে মূলসূত্র, বা যাকে জীবন্ত মানুষ ঈশ্বরজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখে।

এ জিনিসটি না থাকার অর্থ কোনো কিছুই না থাকা।

চিত্তবৃত্তির এই দারিদ্র্য আছে বলেই গুরুতর রকমের কোনো পীড়া, মৃত্যুভয়, পরিবেশ ও মানুষের প্রভাব আমার জীবনে বিপর্যয় আনে। যা কিছু আগে আমি মনন দিয়ে উপলব্ধি করতাম, যা কিছুর মধ্যে আমি জীবনের তাৎপর্য ও আনন্দ খুঁজে পেতাম — সবই হয়ে যায় এলোমেলো, গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে যায়। কাজেই আমার জীবনের শেষ কটি মাস যে দাসোচিত বা বর্বরোচিত কতগুলো চিন্তা দ্বারা কালিমালিপ্ত হয়ে থাকবে এবং নব প্রভাতের দিকে তাকিয়ে দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার থাকবে না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কোনো মানুষের জীবনে যদি সেই বিশেষ জিনিসটি না থাকে যা বাইরের প্রভাবের চেয়েও জোরালো, যার স্থান বাইরের প্রভাবের চেয়েও উঁচুতে, তাহলে জোরাল সর্দি লাগলেই তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়, যে কোনো পাখি দেখলেই পেঁচা মনে করে, যে কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে কুকুর ডাকছে। লোকটির সমস্ত আশা নিরাশা, তার সমস্ত ছোট বড়ো চিন্তার কোনো দামই থাকে না — নিতান্তই কতকগুলো লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি হেরে গেছি। তাই যদি হয় তাহলে এত চিন্তা করেই বা কী হবে, এত কথা বলারই বা কী অর্থ। তার চেয়ে বরং নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ভবিতব্যের জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো।

পরদিন সকালে হোটেলের লোকটি আমাকে চা ও দেশীয় খবরের কাগজ দিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো চোখ বুলিয়ে দেখলাম প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, অন্যান্য সংবাদপত্র ও পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, সংবাদ ... সংবাদের স্তম্ভে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে বিশেষ করে এই খবরটিও আছে: 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কৃতী অধ্যাপক নিকলাই স্তেপানভিচ এন ... গতকল্য এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনে খারকভে আসিয়াছেন এবং ন. হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।'

ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, নামডাকওলা মানুষের নামের আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে, আসল মানুষটির জীবনের সঙ্গে সেই অস্তিত্বের কোনো যোগ নেই। খারকভের পথেঘাটে এখন আমার নামটি অকুণ্ঠ ভাবে বিচরণ করছে এবং আর তিনমাসের মধ্যেই সমাধি ফলকের ওপরে সোনালী অক্ষরে সূর্যের মতো ঝক্‌মক করবে। ততোদিনে আমার শরীর শ্যাওলায় ঢেকে যাবে।

দরজায় টোকা দেবার শব্দ, কে যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

'কে? ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে যে ভেতরে ঢুকল তাকে দেখে বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেলাম। পরনের ড্রেসিং গাউনের ভাঁজগুলোকে টানাটানি করে ঠিক করে নিলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাতিয়া।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে কাতিয়া হাঁপাচ্ছে। জোরে একটা নিশ্বাস টেনে বলল, 'এই যে, খুব অবাক হয়ে গেছ, না? ... আমিও এখানে এসেছি।'

এই বলে ও বসল এবং অনর্গল কথা বলতে লাগল। অল্প অল্প তোত্‌লাচ্ছে, একবারও আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না।

'কী, কথা বলছ না কেন? আমিও এখানে এসেছি ... এই আজই। শুনলাম, তুমি এই হোটেলে আছে। তাই দেখা করতে এলাম।'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু অবাক না হয়েও পারছি না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে। তোমার এখানে কী দরকার?'

'আমার? এই, এমনি চলে এলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আচমকা ও উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

'নিকলাই স্তেপানিচ,' ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাত চেপে ধরেছে বুকের ওপরে। ও বলতে লাগল, 'নিকলাই স্তেপানিচ! এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে! আমি আর পারছি না! আমাকে বলে দাও, আমি কী করব —ভগবানের দোহাই, এক্ষুনি বলো, দেরি কোরো না! বলে দাও আমি কী করব!'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি কী বলতে পারি? আমার কিছু বলার নেই।'

হাঁপাতে হাঁপাতে আর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ও বলতে লাগল, 'তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি বলো। এভাবে জীবন কাটাতে আর পারছি না! কিছুতেই পারছি না। এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য!'

একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ও কাঁদতে লাগল। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা সরিয়ে দিল পেছন দিকে, হাত কচ্‌লাতে লাগল, পা ঠুকতে লাগল মেঝের ওপরে। মাথা থেকে খসে গিয়ে টুপিটা ঝুলতে লাগল দড়ির প্রান্তে। খসে পড়ল চুল।

'আমাকে দয়া করো! দয়া করো আমাকে!' কাকুতি-মিনতি করে ও বলতে লাগল, 'আমি আর পারছি না!'

হাতের থলে থেকে ও একটা রুমাল টেনে বার করল। রুমালটা টেনে বার করতে গিয়ে বেরিয়ে এল খানকয়েক চিঠি। কোলের ওপর থেকে চিঠিগুলো পড়ে গেল মেঝের ওপরে। চিঠিগুলো কুড়িয়ে তুলে দিতে গিয়ে একটি চিঠির হাতের লেখা চিনতে পারলাম। চিঠিটি মিখাইল ফিওদরভিচের লেখা আচমকা চিঠির একটা কথা খানিকটা আমার নজরে পড়ে গেল। কথাটি — 'আবেগময়' ...

বললাম, 'কাতিয়া, আমি কী বলব! আমার কিছু বলার নেই।'

'আমাকে দয়া করো!' আমার হাতটা চেপে ধরে এবং হাতের ওপরে চুমু খেতে খেতে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, 'তুমি আমার বাবার মতো। আমার একমাত্র হিতৈষী! তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছ তুমি। তোমার কাছ থেকে অনেকে শিক্ষা পেয়েছে! আমাকে বলে দাও — আমি কী করব!'

'তোমাকে সত্যিই বলছি কাতিয়া, আমি কিছু জানি না।'

আমি কী করব বুঝতে পারছি না, কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছি। ওর কান্না আমার মন স্পর্শ করেছে। ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও আমার আর নেই।

'কাতিয়া, এসো প্রাতরাশে বসি,' জোর করে মুখের ওপরে হাসি টেনে এনে বললাম, 'আর কে'দো না।'

তারপর একটু পরে বাধো বাধো স্বরে বললাম, 'কাতিয়া, আমি আর কদিন? আমি শিগ্‌গিরই বিদায় নেব!'

কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে ও বলে উঠল, 'শুধু একটা কথা, শুধু একটা কথা। আমাকে বলে দাও আমি কী করব!'

বিড়বিড় করে বললাম, 'ভারি অদ্ভুত মেয়ে তুমি, কাতিয়া! আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার মতো এমন চালাকচতুর মেয়ে, হঠাৎ এমনভাবে কাঁদতে বসলে কেন!'

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। কাতিয়া চুল ঠিক করে নিল, টুপিটা পরল, চিঠিগুলো দুমড়িয়ে দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিল থলের মধ্যে একটিও কথা না বলে, এবং কিছুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে। ওর মুখ, ওর পোশাকের সামনের দিকটা, ওর হাতের দস্তানা চোখের জলে ভিজে গেছে। কিন্তু ওর মুখের ভাবে স্থির নিরুদ্বেগ কাঠিন্য ... আমি ওর চেয়ে সুখী এ কথা বুঝতে পেরে ওর

দিকে তাকিয়ে কেমন লজ্জা করতে লাগল। আমার দার্শনিক বন্ধুরা যাকে বলে ভূয়োদর্শন সে জিনিসটি আমার মধ্যে নেই। আর তা আমি বুঝতে পেরেছি একেবারে আমার মৃত্যুর প্রাক্‌কালে, আমার জীবনের সায়াহ্নে। কিন্তু এই হতভাগিনীর হৃদয় সারা জীবনে আশ্রয় খুঁজে পাবে না, সমস্ত জীবনে না।

বললাম, 'চলো কাতিয়া, প্রাতরাশে বসি।'

নিরুত্তাপ গলায় কাতিয়া জবাব দিল, 'না, দরকার নেই।'

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

বললাম, 'খারকভ শহরটাকে আমার ভালো লাগে না। ভারি নোংরা দেখতে। ভারি একঘেয়ে শহর।'

'আমারও তাই মনে হয়। বিশ্রী। এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকব না... যাবার পথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে গেলাম আর কি। আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ক্রিমিয়ায়... মানে, ককেসাসে।'

'সত্যি? অনেক দিন থাকবে নাকি?'

'জানি না।'

কাতিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুখের ওপরে একটুখানি শীর্ণ হাসি ফুটিয়ে হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

ইচ্ছে হল ওকে জিজ্ঞেস করি: 'তাহলে কাতিয়া, আমাকে সমাধি দেবার সময়ে তুমি থাকবে না?' কিন্তু ও আমার দিকে ফিরে তাকাল না। ওর হাতের ছোঁয়ায় এতটুকু আবেগ নেই, যেন অপরিচিত লোকের হাত। নিঃশব্দে আমি ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলাম। এবার ও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, লম্বা বারান্দা পার হয়ে ও চলে যাচ্ছে, একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। ও জানে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। বারান্দার শেষে ও যখন বাঁক নেবে তখন নিশ্চয়ই একবার ফিরে তাকাবে।

কিন্তু ও ফিরে তাকাল না। ওর পরনের কালো পোশাক চোখের আড়াল হয়ে গেল, ওকে আর দেখা গেল না...

বিদায়, সোনামণি আমার!

প্রজাপতি

১

ওলগা ইভানভ্‌নার বিয়েতে ওর বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত সবাই এসেছে।

'ওকে দেখ, ওর মধ্যে কিছু একটা আছে, তাই না?' স্বামীকে দেখিয়ে ওলগা ইভানভ্‌না বন্ধুদের বলল। অখ্যাত অতি সাধারণ একটি লোককে বিয়ে করতে রাজী হল কেন, এই কথাটা বোঝানর জন্য ও স্পষ্টই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওর স্বামী ওসিপ স্তেপানিচ দীমভ একজন ডাক্তার। পদ 'টিটুলার কাউন্সেলার'। কাজ করে দু'টো হাসপাতালে—একটাতে অনাবাসিক ওয়ার্ডের চিকিৎসক, এবং আর একটাতে শব ব্যবচ্ছেদের কাজ করে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর পর্যন্ত বহির্বিভাগের রোগী দেখা ও ওয়ার্ডে ঘোরা; তারপর বিকেলে ঘোড়ায় টানা ট্রামে চড়ে চলে যাওয়া অন্য হাসপাতালে; সেখানে কাজ শব ব্যবচ্ছেদ করা। নিজস্ব 'প্র্যাকটিস্'খুব অল্পই — বছরে শ'পাঁচেক রুবল। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। এর বেশি ওর সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। ওলগা ইভানভনা এবং তার বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতরা কিন্তু কেউই সাধারণ লোক নয়। ওদের মধ্যে প্রত্যেকেরই কোন না কোন ব্যাপারে বৈশিষ্ট্য আছে, এবং একেবারে অখ্যাতও বলা চলে না। প্রত্যেকেই কিছুটা নাম ও খ্যাতি অর্জন করেছে, সেটা যদি পুরোদস্তুর নাও মিলে থাকে, ওদের সকলের সামনেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। একজন হলেন অভিনেতা, এঁর নাট্য প্রতিভা ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে,মার্জিত রুচি, চতুর ও বিচক্ষণ, সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন। ইনি ওলগা ইভানভনাকে বাচনভঙ্গী শেখান। আর একজন অপেরা গায়ক—মোটাসোটা, ভাল মানুষ ধরনের ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, ওলগা ইভানভনা নিজেকে নষ্ট করে ফেলছে, এত অলস না হয়ে একটু শক্ত হতে

পারলে ও একজন সুগায়িকা হতে পারত। এছাড়া আরও কয়েকজন শিল্পী আছেন, তার মধ্যে প্রধান রিয়াবোভস্কি। সাধারণ জীবনের ছবি আঁকেন, জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যও এঁকে থাকেন। বছর পঁচিশ বয়সের অপূর্ব সুদর্শন যুবক। চুলগুলো তার সোনালী। প্রদর্শনীতে এঁর ছবিগুলো অত্যন্ত সমাদর পেয়েছে শেষ ছবিখানি বিক্রী হয়েছে পাঁচশ রুবলে। ইনি ওলগা ইভানভনার আঁকা স্কেচ্‌গুলোতে শেষ টান দিয়ে দেন, আর সব সময়ই বলেন যে ওলগা ইভানভনার ছবিগুলোর মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে।এ ছাড়া আছেন একজন বেহালা বাদক—ইনি বেহালাকে ঠিক কাঁদাতে পারেন। ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবেই বলেন যে ও'র জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ওলগা ইভানভনাই হল বাজনার যোগ্য সঙ্গী। আর আছেন সেই লোকটি—বয়সে তরুণ, কিন্তু ছোট উপন্যাস, নাটিকা ও গল্প লিখে ইতিমধ্যেই নাম করে ফেলেছেন। আর কে বাকি রইলেন? ও, হ্যাঁ, আর আছেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ—মার্জিত-রুচি জমিদার, শখের বইয়ের ছবি-আঁকিয়ে ও নক্সাকারী—অতীত রুশীয় স্টাইল, পুরাণ কথা ও মহাকাব্যের প্রতি এঁর সত্যিকারের আকর্ষণ ছিল। কাগজ, চিনামাটি ও ধূমায়িত পাত্রের গায়ে ইনি অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত সৃষ্টি করতে পারেন। উদারপন্থী, শিল্পীসমাজের সভ্যভব্য এইসব ভাগ্যবানেরা ডাক্তারদের কথা মনে করতেন শুধু অসুস্থ হয়ে পড়লে। দীমভ নামটা এঁদের কানে সিদরভ, তারাসভ প্রভৃতি অতি সাধারণ নামের মতোই মনে হয়। যথেষ্ট দীর্ঘকায় ও প্রশস্ত বক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দীমভ এঁদের কাছে ছিল অপরিচিত, অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। ওর ফ্রককোটটা দেখে মনে হয় ওটা বুঝি অন্যের জন্য তৈরি হয়েছিল; ওর দাড়িটা ঠিক ব্যবসাদারদের মতো। অবশ্য ও যদি লেখক কিংবা শিল্পী হত, তাহলে ঐ দাড়িতেই ওকে 'জোলার' মতো দেখাচ্ছে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করত। অভিনেতা ওলগা ইভানভনাকে বললেন যে, 'রেশমের মতো চুল আর বিয়ের পোষাকে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন বসন্তের সাদা সাদা নরম ফুলে ঢাকা কৃশাঙ্গী চেরিগাছ।'

'না, না শোন,' ওলগা ইভানভনা ওর হাত ধরে বলল, 'কী করে এটা ঘটল? শোনই না আমার কথা ... জানত, আমার বাবা আর দীমভ একই হাসপাতালে কাজ করত। বাবার অসুখের সময় দীমভ দিনরাত ও'র বিছানার পাশে বসে থাকত। সে কী আত্মত্যাগ! রিয়াবোভস্কি শুনছ! লেখক তুমিও শোন, খুব মজার

ব্যাপার। সরে এস। সে কী আত্মত্যাগ, কী আন্তরিক দরদ! আমিও রাতে ঘুমোতাম না, বাবার পাশে বসে থাকতাম। হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎ এই বলিষ্ঠ তরুণের হৃদয় জয় করে ফেললাম। এই হল ব্যাপার! আমার দীমভও প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। ভাগ্যের কী বিচিত্র লীলা! বাবা মারা যাওয়ার পর দীমভ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। মাঝে মাঝে আমরা বাইরেও দেখা করতাম। হঠাৎ এক শুভ সন্ধ্যায়—শুনেছ তোমরা! একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ও বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। সেদিন সারা রাত আমি কেঁদেছি। আমিও প্রেমে পাগল। আর দেখতেই পাচ্ছ, আজ আমি বিবাহিতা মহিলা। ওর মধ্যে একটা সুদৃঢ় বলিষ্ঠতা, একটা ভাল্লুকে ভাব আছে, তাই না? এখন ওর মুখের তিনভাগ দেখা যাচ্ছে—মুখ ফেরালে ওর কপালের দিকে তাকিও। এরকম কপাল সম্বন্ধে তোমার কী মত রিয়াবোভস্কি? দীমভ, আমরা তোমার কথাই বলছি,' ওলগা ইভানভনা ওর স্বামীকে চেঁচিয়ে বলল। 'এদিকে এস, রিয়াবোভস্কির সঙ্গে হাত মেলাও... হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।'

অকপট খুশিমাখা হাসির সঙ্গে রিয়াবোভস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে দীমভ বলল, 'আনন্দিত হলাম, কলেজে আমার সঙ্গে রিয়াবোভস্কি নামে একটি ছেলে পড়ত। সে বোধহয় আপনার কোন আত্মীয় তাই না?'

২

ওলগা ইভানভনার বয়স বাইশ, দীমভের একত্রিশ। বিয়ের পর ওদের দিন কাটছিল খুব চমৎকার। ড্রয়িংরুমের দেয়ালগুলো ওলগা ইভানভনা নিজের ও বন্ধুদের আঁকা বাঁধানো অবাঁধানো ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, বড় পিয়ানো ও আসবাবপত্রের চারিদিকে আর্টিস্টিক ভঙ্গীতে ছড়িয়ে রেখেছে চীনা ছাতা, ছবি আঁকার ফ্রেম, রং বেরং-এর ঢাকনা, ছোরা, ছোট ছোট আবক্ষ মূর্তি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি নানান জিনিস। খাবার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছে সস্তা দরের ছাপান ছবি, লাপ্তি ও কাস্তে আর কোণের দিকে জড় করে রাখা হয়েছে একখানা বড় কাস্তে ও একটা আঁচড়া, রুশীয় গ্রাম্য কায়দায় সাজানো দস্তুরমত একখানা খাবারঘর। শোওয়ার ঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলো গাঢ় রংএর কাপড়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া

হয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন একটা গুহা, বিছানার উপর ঝুলছে একটা ভেনিশীয় লণ্ঠন, আর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে টাঙ্গি হাতে একটা মূর্তি। দেখে সবাই বলত যে এই তরুণ দম্পতি একটা চমৎকার বাসা বেঁধেছে। ওলগা ইভানভনা রোজ ঘুম থেকে ওঠে এগারটায়। উঠে পিয়ানো বাজায় কিংবা সূর্যোজ্জ্বল দিনে তেল রঙা ছবি আঁকে। বারটার একটু পরেই ও চলে যায় ওর দর্জির কাছে। ওর আর দীমভের সামান্য যা টাকা আছে তাতে শুধু প্রয়োজনটুকুই মেটে, কাজেই নিত্য নতুন পোষাকে মানানসইভাবে বেরোতে হলে ওকে আর ওর দর্জিকে হরেক রকম মাথা খাটাতেই হয়। শুধু একটা পুরোনো রঙীন ফ্রক আর টুকরো টাকরা পাতলা কাপড় ও লেশ দিয়ে বারে বারেই স্রেফ ভোজবাজির মতো অপূর্ব মনোমুগ্ধকর যে জিনিষটি তৈরি হত, সেটা শুধু পোষাক নয়, যেন একটা স্বপ্ন। দর্জির কাছ থেকে ওলগা ইভানভনা যায় ওর কোন অভিনেত্রী বান্ধবীর বাড়ি থিয়েটারের খবর নেবার আর কোন 'প্রথম রজনী' বা কারও 'সাহায্য রজনী'র টিকিট সংগ্রহের চেষ্টায়। অভিনেত্রীর বাড়ি থেকে ওকে যেতে হয় কোন শিল্পীর স্টুডিওতে কিংবা কোন ছবির প্রদর্শনীতে, তারপর কোন নামকরা লোকের কাছে—হয় তাঁকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে, না হয় ত পাল্টা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কিংবা শুধুই গল্প করতে। যেখানেই যাক সবাই ওকে খুশি মনে হৃদ্যতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানায়, আর ও যে খুব ভাল, মিষ্টি ও অসাধারণ এ আশ্বাস মেলে। ও যাদের বিখ্যাত ও উচ্চস্তরের লোক বলে ভাবে, তারা সবাই ওকে নিজেদের সমপর্যায়ের একজন হিসাবেই গ্রহণ করে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে হাজার রকম কাজে প্রতিভার অপচয় না করলে ওর যা ক্ষমতা, রুচি ও মন আছে, তাতে ও বড় দরের কেউ একজন হয়ে উঠবে। ও গান গায়, পিয়ানো বাজায়, তেল রঙের ছবি আঁকে, মাটি দিয়ে মডেল গড়ে, সখের থিয়েটারে অভিনয় করে। যেমন তেমন ভাবে নয়, সবেতেই ওর প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোক সজ্জার জন্য লণ্ঠন তৈরি, প্রসাধন, কিংবা শুধু কারও টাইটা বেঁধে দেওয়া—যাই ও করুক না কেন, সবই বেশ একটা শিল্পীসুলভ, মার্জিত ও মনোলোভা হয়ে ওঠে। তবে বন্ধুত্ব পাতাতে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতা জমাতে ওর প্রতিভার বিকাশ হয় সব থেকে বেশি। কোন লোক সামান্যতম বৈশিষ্ট্য অর্জন করার কিংবা আলোচ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওলগা ইভানভনা তার সঙ্গে পরিচয়

জমিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে এবং বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসে। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিনটি প্রতিবারই ওর কাছে অনন্য। খ্যাতিমানদের ও পূজা করে, তারা ওর গর্ব, প্রতিরাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। বিখ্যাতদের দিকে ওর ভারি ঝোঁক—কিছুতেই সে আকাংক্ষা তৃপ্ত হয় না। পুরোনো বন্ধুরা অদৃশ্য ও বিস্মৃত হয়ে যায়, তার জায়গায় আসে নতুনেরা, ক্রমে এদের সম্পর্কেও আসে ক্লান্তি কিংবা হতাশা, অধীর আগ্রহে ও খোঁজে নূতনতর বন্ধু, নূতনতর খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাদের পাবার পর অন্যদের সে খোঁজে। কিন্তু কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ও বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে ডিনার খায়। দীমভের সারল্য, সাধারণ বুদ্ধি ও হাসিখুশি ভাব ওলগা ইভানভনার মনে শ্রদ্ধা ও হর্ষ জাগায়। অনবরতই ও লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে আর স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বনবৃষ্টি করে যায়।

'তুমি বুদ্ধিমান, উন্নতমনা—কিন্তু দীমভ, একটা ভীষণ দোষ আছে তোমার। আর্ট সম্পর্কে তোমার কোনরকম আকর্ষণ নেই। গান ও ছবি আঁকাকে তুমি উপেক্ষা করো।'

'আমি যে ওগুলো বুঝি না,' দীমভ সবিনয়ে বলে, 'আমি সারা জীবন কাজ করেছি প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে, আর্টের দিকে নজর দেওয়ার সময়ই পাইনি।'

'এটা কিন্তু খুবই অন্যায় দীমভ।'

'কেন? তোমার বন্ধুরা কেউ প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেন না, আর সেটা তাঁদের দোষ বলে তুমি মনে করো না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয় নিয়ে থাকবে। ছবি আঁকা বা অপেরা আমি বুঝি না, তবে আমি তাদের দেখি এইভাবে যে যেহেতু কিছু বুদ্ধিমান লোক এইসবের জন্য তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং আর একদল বুদ্ধিমান লোক যখন এ সবের জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করছেন, তখন নিশ্চয় এগুলোর প্রয়োজন আছে। আমি বুঝি না সত্যি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি এগুলোকে উপেক্ষা করি।'

'তোমার সৎ হাতগুলোর সঙ্গে হাত মেলাতে দাও!'

ডিনারের পর ওলগা ইভানভনা পরিচিতদের বাড়িতে যায় তারপর যায়

থিয়েটারে কিংবা কনসার্টে। বাড়ি ফিরতে সেই মধ্যরাত্রি। প্রতিদিনই এরকম চলতে থাকে।

বুধবার সন্ধ্যাবেলা ও নিজের বাড়িতে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে। সেদিন তাস খেলা বা নাচ হয় না—সেদিন ওরা শিল্পচর্চার আনন্দ উপভোগ করে। খ্যাতিমান অভিনেতাটি আবৃত্তি করেন, গায়ক গান করেন, শিল্পীরা ওলগা ইভানভনার অসংখ্য অ্যালবামে ছবি আঁকেন, বেহালা বাদক বাজনা বাজান, এবং গৃহকর্ত্রী নিজেও আঁকে, মডেল তৈরি করে, গান গায়, বাজনা বাজায়। গান বাজনার মাঝে মাঝে বিরতির সময় ওরা শিল্প, সাহিত্য ও অভিনয় নিয়ে আলোচনা ও তর্ক চালায়। দলের মধ্যে মহিলা আর কেউ থাকেন না, কারণ ওলগা ইভানভনার কাছে অভিনেত্রীরা এবং ওর দর্জি ছাড়া অন্য সব মেয়েরাই তুচ্ছ ও বিরক্তিকর। প্রতিটি বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিবার দরজায় ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রী সচকিত হয়ে উৎফুল্ল মুখে বলে ওঠেন: 'ঐ উনি এলেন!' উনি বলতে আমন্ত্রিত নতুন বিখ্যাত লোকটিকেই বোঝায়। দীমভকে কিন্তু ড্রয়িংরুমে পাওয়া যায় না, আর তার কথা কারুর মনেও থাকে না। ঠিক সাড়ে এগারটার সময় খাবার ঘরের দরজাটা খুলে যায়, আর দরজার উপর দেখা যায় দীমভকে, ভালমানুষি মাখা হাসি হাসি মুখে দুহাত কচলে ডাক দিচ্ছে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, খাবার প্রস্তুত।'

সবাই খাবার ঘরে ঢোকে, প্রত্যেকবারই দেখা যায় সেই একই জিনিস: এক ডিস গুগলি এক পদ শুকর কিংবা বাছুরের মাংস, সার্ডিন মাছ, পনীর, ক্যাভিয়ার, ব্যাঙের ছাতার আচার, ভদকা ও দুই ডিকাণ্টার মদ।

খুশিতে হাত কচলে ওলগা ইভানভনা বলে ওঠে, 'আমার মেত্র দ্য' তেল। সত্যিই তুমি অপূর্ব! ওর কপালের দিকে চেয়ে দেখ! দীমভ মুখখানা আমাদের দিকে ঘোরাও ত। দেখ, সবাই দেখুন — ঠিক যেন বাংলার বাঘ, আর ভাবখানা দেখছেন, কেমন হরিণের মত মিষ্টি আর করুণ! ডার্লিং!'

অতিথিরা খেতে খেতে দীমভের দিকে চেয়ে ভাবে, 'লোকটি সত্যিই ভাল।' একটু পরেই ওরা কিন্তু ওকে ভুলে যায় এবং অভিনয়, গান বাজনা ও শিল্পের আলোচনায় যায় ডুবে।

তরুণ দম্পতিটি সুখেই ছিল, ওদের জীবনও কাটছিল স্বচ্ছন্দে। অবশ্য মধুচন্দ্রিকার তৃতীয় সপ্তাহটি ওদের বিশেষ ভাল যায়নি—বলতে গেলে

মনোকষ্টেই কাটে। হাসপাতালে ইরিসিপেলাসের ছোঁয়াচ লেগে দীমভকে ছ'দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। ওর সুন্দর কাল চুলগুলি একেবারে গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলতে হয়। ওলগা ইভানভনা এই সময় ওর বিছানার পাশে বসে ভীষণ কাঁদত। অবশ্য একটু ভাল হতেই ও দীমভের কদমছাঁট চুলের উপর একটা রুমাল বেঁধে দিয়ে ওর ছবি আঁকতে লাগল, যেন ও একটা বেদুইন। দু জনেই এতে খুব মজা পেত।

সম্পূর্ণ সেরে উঠে হাসপাতালে যাওয়া শুরু করার তিনদিন পরেই নতুন আর এক ফ্যাসাদ বাধল।

একদিন ডিনারে বসে দীমভ বলল, 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ, বুঝলে? আজ চারটে মড়াকাটা ছিল, শুরুতেই দুটো আঙুল কেটে গেল। তাও দেখতে পেলাম বাড়িতে এসে।'

ওলগা ইভানভনা ভয় পেয়ে গেল। দীমভ অবশ্য হেসে বলল যে ঘটনাটা তেমন কিছু নয়, মড়া কাটতে গিয়ে আগেও অনেকবার ওর হাত কেটে গিয়েছে। 'কী রকম যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি আর অন্যমনস্ক হয়ে যাই।'

রক্তদুষ্টির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওলগা ইভানভনা দিন গুনতে থাকে। প্রতিরাত্রেই ও প্রার্থনা করে যেন কিছু না ঘটে। ব্যাপারটা অবশ্য নিরুপদ্রবেই কেটে গেল, দুঃখ ও উদ্বেগের স্পর্শমুক্ত সেই পুরোনো শান্তিপূর্ণ জীবন আবার এল ফিরে।

বর্তমানটা চমৎকার। বসন্ত আসন্ন, দূর থেকে দেখা যায় তার স্মিত হাসি, কত শত আনন্দের ইশারা। সুখ যেন চিরন্তন। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিনটে মাস ওরা যাবে মস্কো থেকে বহুদূরে, বাগানবাড়িতে; সেখানে থাকবে বেড়ান, ছবি আঁকা, মাছধরা, নাইটিঙ্গেলের গান। এরপর জুলাই থেকে পুরো শরৎকাল পর্যন্ত শিল্পীদল ভলগায় প্রমোদ-ভ্রমণ করবে এবং স্থায়ী সদস্য হিসাবে ওলগা সেই দলে যোগ দেবে। ও ইতিমধ্যেই দুটো হালকা বেড়ানর পোষাক তৈরি করে নিয়েছে; রং, তুলি, ক্যানভাস্ ও নতুন একটা রংএর পাত্রও কিনে ফেলেছে। রিয়াবোভস্কি প্রায় প্রতিদিনই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে—উদ্দেশ্য, ওলগা ইভানভনার পেণ্টিং কী রকম চলছে, দেখা। সে যখন ছবিগুলো দেখায়, প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে রিয়াবোভস্কি বলে:

'বেশ, বেশ ... কিন্তু মেঘটা মনে হচ্ছে চেঁচাচ্ছে ... ওটা কিন্তু গোধূলির আলো হয়নি। সামনের পটভূমিটা একটু জবড়জং হয়ে গেছে; কী যেন একটা ... আমার কথা বুঝতে পারছ বোধহয়, কিসের যেন একটা অভাব রয়ে গিয়েছে ... তোমার কুটিরটা মনে হচ্ছে যেন চেপ্টে গিয়ে করুণভাবে গোঙাচ্ছে . ঐ কোনাটা আর একটু গাঢ় করে দাও। মোটের ওপর খুব খারাপ হয়নি ... খুশি হয়েছি।'

ওর কথাগুলো যত অস্পষ্ট হয়, ওলগার কাছে তত বেশি হয়ে ওঠে বোধগম্য।

■

হুইটমনডে-তে বিকেলে স্ত্রীর জন্য খাবারদাবার মিঠাই-মণ্ডা কিনে দীমভ বেরিয়ে পড়লো বাগানবাড়ির উদ্দেশে। প্রায় পক্ষকাল দেখা হয় না — বিরক্তিকর বিরহ। রেলগাড়িতে এবং তারপর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে কুটির খুঁজে বার করতে করতে ওর ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেল। ও মনে মনে কল্পনা করতে থাকল, স্ত্রীর সঙ্গে বসে বেশ আয়েস করে রাতের খাওয়া খাবে, তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়বে। ক্যাভিয়ার, পনীর ও শুঁটকী মাছ ভরতি পার্সেলটার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে বেশ খুশি খুশি লাগল।

বাড়িটা যখন খুঁজে বের করতে পারল, সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। বুড়ো চাকরটা জানাল কর্ত্রী বাড়ি নেই, তবে সম্ভবত শীগ্‌গিরই ফিরবেন। গ্রীষ্মাবাসটার কাঠামো মোটেই আকর্ষণীয় নয়। নিচু ছাদগুলোয় কাগজ লাগান, এবড়োখেবড়ো মেঝেটার মাঝে মাঝে ফাঁক। মাত্র তিনখানা ঘর। একটাতে বিছানা পাতা; পরেরটাতে ক্যানভাস্, রংয়ের তুলি, একটা ময়লা কাগজের টুকরো এবং চেয়ারের উপর কতকগুলো পুরুষদের কোট ও টুপি; আর তৃতীয়টাতে ঢুকতেই দেখা গেল জনতিনেক অপরিচিত লোক বসে আছে। তার মধ্যে দুজন দাড়িওলা, চুলের রং কাল আর তৃতীয়জন পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো, বেশ মোটা, মনে হল অভিনেতা ভদ্রলোক। টেবিলের উপর সামোভারে জল ফুটছে।

'কী চাই?' অপ্রীতিকর দৃষ্টি হেনে দরাজ গলায় অভিনেতা জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওলগা ইভানভনার সঙ্গে দেখা করতে চান? একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখনি এসে পড়বে।'

দীমভ বসে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কালচুলওলা লোক দুটির মধ্যে

একজন ওর দিকে অবসন্ন নিদ্রালু চোখে তাকিয়ে নিজের জন্য খানিকটা চা ঢেলে বলল, 'একটু চা চলুক?'

দীমভের ক্ষিদে এবং তৃষ্ণা দুইই পেয়েছিল, কিন্তু ক্ষিদের তীব্রতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে ও চা খেল না। অচিরেই পদশব্দ ও পরিচিত হাসি শোনা গেল। একটা দরজা খুলে গেল, চওড়া কিনারওলা টুপি মাথায় ও হাতে একটা বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকল ওলগা ইভানভনা। ওর পিছু পিছু ঢুকল রিয়াবোভস্কি — বগলে একটা বড় ছাতা ও একটা গোটান টুল, খুশি মেজাজ, গালদুটো টকটক করছে।

'দীমভ!' খুশিতে রাঙা হয়ে ওলগা ইভানভনা চেঁচিয়ে উঠল। দীমভের বুকে মাথা আর হাত দু খানা রেখে আবার বলল, 'দীমভ! তুমি এতদিন আসনি কেন? কেন? কেন?'

'কখন আসি, জান তো কীরকম ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া যখন ফুরসৎ পাই, ঘটনাক্রমে সে সময় ট্রেন পাওয়া যায় না।'

'ওঃ তোমায় দেখে কী খুশিই যে হয়েছি! সারা রাত, সারাটা রাত তোমায় স্বপ্ন দেখি। মাঝে মাঝে ভয় হত কি জানি হয়ত তোমার অসুখ করেছে। ওঃ তুমি যে কত ভাল তা যদি জানতে! কী সৌভাগ্য তুমি এসে পড়েছ! তুমিই আমার ত্রাতা হবে। একমাত্র তুমিই আমায় বাঁচাতে পার। আগামীকাল এখানে সব থেকে চমকপ্রদ বিয়ে হচ্ছে,' হেসে হেসে স্বামীর টাইটা নতুন করে বাঁধতে বাঁধতে ওলগা ইভানভনা বলে চলল, 'স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটর চিকেল্‌দেয়েভের কাল বিয়ে। দেখতে বেশ সুন্দর, চালাকচতুর যুবক, চোখে মুখে একটা দৃঢ় ভাল্লুকে ভাব আছে ওর। যৌবনদৃপ্ত কোনো ভারাঙ্গিয়ানের মডেল হতে পারে। আমরা গ্রীষ্মের বাসিন্দারা সবাই ওকে ভালবাসি, কথা দিয়েছি ওর বিয়েতে যাব। বেচারা একটু মুস্কিলে আছে — ধনী নয়, একা, তাছাড়া লাজুক, আমাদের পক্ষ থেকে কিছু না করাটা অন্যায় হবে। ভেবে দেখ, বিয়ে হবে ঠিক দুপুরের উপাসনার পর, সবাই গীর্জা থেকে সোজা কনের বাড়ি যাব .. ঝোপঝাড়, পাখীর গান, ঘাসের উপর সূর্যের ছোপ এবং আমরাও যেন ঝকঝকে সবুজ আস্তরণের উপর রঙীন ছোপ — ভাবটা কেমন মৌলিক বলত! ঠিক ফরাসী এক্সপ্রেসোনিস্টদের মতো। কিন্তু আমি কী পরে গীর্জায় যাব দীমভ?' মুখখানা

করুণ করে ওলগা ইভানভনা বলল, 'এখানে ত আমার কিছুই নেই — পোষাক, ফুল, দস্তানা কিছুই নেই। তোমাকে আমায় বাঁচাতেই হবে। এক্ষুনি তোমার আসার মানে নিয়তি, তুমি আমাকে বাঁচাও। লক্ষ্মী সোনা আমার, চাবিটা নিয়ে একবার বাড়ি চলে যাও, আলমারি থেকে আমার গোলাপী রং-এর পোষাকটা নিয়ে এস। দেখেছ ত, ঠিক সামনেই ঝুলছে! ... আর যে ঘরে বাক্সগুলো আছে, তার মেঝের উপর ডান দিকে দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্স পাবে. ওপরেরটা খুললেই দেখবে অনেক টুকরো টুকরো রেশমের লেস, লেস আর লেস এবং নানান ধরনের টুকিটাকি জিনিস, সেগুলোর তলায় আছে ফুল। সব ফুলগুলো বের করে নিয়ে এস, খুব সাবধানে কিন্তু, দুমড়ে ফেল না যেন, আমি ও থেকে পরে কিছু বেছে নেব'খন। আর এক জোড়া দস্তানা কিনে এন আমার জন্যে।'

'বেশ,' দীমভ বলল, 'আমি কাল ফিরে গিয়ে সব পাঠিয়ে দেব।'

'কাল?' ওলগা ইভানভনা বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে পুনরুক্তি করল, 'কিন্তু কাল তো তুমি সময়মত এসে পেঁছাতে পারবে না! কাল প্রথম ট্রেন ছাড়বে ন'টায় আর বিয়ে হচ্ছে এগারটায়। না না লক্ষ্মী, তোমায় আজই যেতে হবে, আজই! কাল যদি তুমি নিজে না আসতে পার, অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। নাও চল, এখনি ট্রেন এসে পড়বে। লক্ষ্মীটি, দেরী কোরো না।'

'বেশ!'

'তোমাকে ছেড়ে দিতে কী খারাপই যে লাগছে,' বলতে বলতে ওলগা ইভানভনার চোখে জল উথলে ওঠে, 'ওঃ, টেলিগ্রাফ অপারেটরকে কথা দিয়ে কী বোকামীই যে করেছি!'

এক গ্লাস চা গিলতে গিলতে আর একটা বিস্কুট তুলে নিতে নিতে নম্র ক্ষীণ হাসি হেসে দীমভ স্টেশনে চলে গেল। ক্যাভিয়ার, পনীর ও শুঁটকী মাছ খেল কালচুলওলা লোকদুটি আর মোটা অভিনেতাটি।

■

জুলাই-এর এক নিথর চাঁদনী রাত। ভলগা স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে ওলগা ইভানভনা একবার জল আর একবার অপূর্ব তটরেখার দিকে চেয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে রিয়াবোভস্কি বলে চলেছে যে ঐ যে জলের উপর

কালো ছায়া, ছায়া নয় যেন স্বপ্ন ... এই কুহকী ঝকঝকে জল, এই অনন্ত আকাশ, বিষণ্ণ ধ্যানমগ্ন নদীতট যেন বলছে, অসার এই জীবন আমাদের, মনে করিয়ে দেয় এসবের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে যা শাশ্বত, সানন্দ . এমন ক্ষণটিতে ইচ্ছা হয় সবকিছু ভুলে যাই, মনে হয় আসুক মৃত্যু, ভাল লাগে শুধু স্মৃতিপটে জেগে থাকতে, মনে হয় অতীতটা কী তুচ্ছ, কী নীরস, আর কী নিরুদ্দিষ্ট অনাগত ভবিষ্যৎ! এমনকি আজকের এই রাতটি, যা আর কোনদিনই ফিরে আসবে না, এও শেষ হবে, মিশে যাবে অনন্ত কালসমুদ্রে— কেন তবে বেঁচে থাকা?

ওলগা ইভানভনা কান পেতে শুনছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে রিয়াবোভস্কির কণ্ঠস্বর, কখনো কান পাতছে রাত্রির নিস্তব্ধতার দিকে আর নিজের মনে মনে বলছে, আমি অমর, আমার মৃত্যু নেই। এই অদৃষ্টপূর্ব রঙীন মণির মতো জলরাশি, এই আকাশ, নদীতট, কালোছায়া, আর এই হৃদয়-ভরা দুর্জ্ঞেয় সুখ — সবকিছুই যেন বলছে, একদিন সে হবে মস্ত বড় এক শিল্পী, যেন বলছে, দূরে দূরান্তরে, চাঁদনী রাতের ওপারে অনন্ত শূন্য স্থানে অপেক্ষা করে আছে ওর সাফল্য, ওর যশ, ওর প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা... অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ও যেন প্রত্যক্ষ করছে জনতা, আলোকমালা, পবিত্র সঙ্গীত, উৎসাহের উল্লাস। যেন ওর পরিধানে রয়েছে শুভ্র পরিধেয়, আর চারিদিক থেকে ওর উপর ঝরে পড়ছে পুষ্পবৃষ্টি। মনে মনে নিজেকে ও বলে চলেছে যে ওর পাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভাশালী, ঈশ্বর মনোনীত সত্যিকারের এক মহান পুরুষ... এতকাল যা কিছু সে করেছে সবই অপূর্ব, নতুন, অসাধারণ— ভবিষ্যতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর অনন্যসাধারণ প্রতিভা পরিণত হলে ও যা সৃষ্টি করবে তা হবে চমকপ্রদ, অপরিমেয়; ওর মুখচোখ, ওর প্রকাশ ভঙ্গিমা আর প্রকৃতি সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ছায়া, সন্ধ্যার রং, কিংবা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য বর্ণনায় ওর একটা বিশেষ স্বকীয়ভাষা আছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে ওর মোহিনী শক্তি প্রায় অদম্য। তাছাড়া, সুন্দর ও অসাধারণ ওর জীবনটা মুক্ত স্বাধীন পাখীর মতো ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

'ঠাণ্ডা লাগছে,' ওলগা ইভানভনা কেঁপে উঠল।

রিয়াবোভস্কি নিজের কোটটা ওকে জড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলল, 'মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার অধীন, তোমার গোলাম। আজ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?'

ওলগা ইভানভনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ও রইল। ওর চোখে দুর্নিবার কী যেন একটা আছে। ওর দিকে তাকাতে ওলগা ইভানভনার ভয় হচ্ছে।

'আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি,' রিয়াবোভস্কি ফিসফিস করে বলল। ওলগা ইভানভনার গালের উপর পড়ল ওর নিঃশ্বাস। 'তুমি একটা কথা বললেই আমি জীবনকে থামিয়ে দেব, ছুঁড়ে ফেলে দেব আমার শিল্পকলা ... আমায় ভালোবাস, ভালোবাস আমায় ...' অসীম উত্তেজনায় ও বলে চলল।

'অমন করে বোলো না,' ওলগা ইভানভনা চোখ বুজে বলল, 'আমার ভয় করে। দীমভের কী হবে?'

'দীমভ? দীমভের কথা কেন? দীমভের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এই ভলগা, ঐ চাঁদ, এই সৌন্দর্য, আমার প্রেম, আমার আনন্দ, কিন্তু দীমভ নয় ... কিছু জানতে চাই না আমি, প্রয়োজন নেই অতীতে। আমাকে দাও শুধু একটি মুহূর্ত। শুধু ছোট্ট একটি মুহূর্ত।' ওলগা ইভানভনার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। স্বামীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু সমস্ত অতীত — ওর বিয়ে, দীমভ, বুধবারের সন্ধ্যাগুলো মনে হল সব ছোটো, তুচ্ছ, একঘেয়ে, নিরর্থক, সব চলে গেছে দূরে, বহুদূরে... তাছাড়া কিসের দীমভ? কেন দীমভ? কী সম্পর্ক দীমভের সঙ্গে? সত্যিই কি ছিল এমন কেউ, না কি সব স্বপ্ন?

মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের মনকে ও বলল, 'যতটুকু সুখ দীমভ পেয়েছে, তার মতো সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট। ওরা বিচার করুক ওখানে বসে, দিক ওরা অভিশাপ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, হ্যাঁ, ওদের তাচ্ছিল্য করে চলে যাব ধ্বংসের সীমান্তে। জীবনে সব কিছু অনুভব করা দরকার। ওঃ ভগবান, কী ভীষণ অথচ কী সুন্দর!'

'বল বল,' শিল্পী ওকে জড়িয়ে ধরে হাত সতৃষ্ণভাবে চুম্বন করল। ওর হাত দুটো দিয়ে দুর্বল ভাবে সে চেষ্টা করল তাকে সরিয়ে দিতে। শিল্পী মৃদুস্বরে বলে চলল, 'বল তুমি আমায় ভালোবাস! কী অপরূপ, কী মধুর রাত!'

'সত্যি কী অদ্ভুত রাত!' শিল্পীর জলভরা চোখের দিকে চেয়ে ওলগা ইভানভনা ফিসফিস করে বলল। চটপট চারদিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটের উপর গভীর চুম্বন দিলো এ'কে।

ডেকের ওপর দিক থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আর এক মিনিটের মধ্যে আমরা কিনেশ্মা পে'ছৈ যাব।' সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভারি পদশব্দ। খাবার ঘরের লোকটি চলে যাচ্ছিল।

'শোন,' ওলগা ইভানভনা সানন্দে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে লোকটিকে ডেকে বলল, 'কিছু মদ আনতো আমাদের জন্যে।'

উত্তেজনায় বিবর্ণ শিল্পী একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে মুগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওলগা ইভানভনার দিকে তাকাল, তারপর চোখ বুজে ক্লান্ত হাসি হেসে বলল, 'আমি শ্রান্ত।'

ধীরে ধীরে তার মাথাটা রেলিংএর উপর নেমে এলো।

৫

সেপ্টেম্বর মাসের দোসরা ছিল গরম ও শান্ত, অথচ কুয়াশাচ্ছন্ন। ভোরের দিকে একটা পাতলা কুয়াশা নেমে এসেছে ভলগার উপর। ন'টার পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। পরিষ্কার হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নেই। চা খাবার সময় রিয়াবোভস্কি ওলগা ইভানভনাকে বলেছে যে পেণ্টিং হল সব থেকে অকৃতজ্ঞ ও একঘেয়ে আর্ট, সে শিল্পী নয়, একমাত্র নির্বোধরাই ওর প্রতিভায় বিশ্বাস করে। তারপর একেবারে আচমকা একটা ছুরি দিয়ে ওর সব থেকে ভাল স্কেচটা কেটে ফেলেছে। চা খাবার পর ও মনমরা হয়ে জানলার ধারে বসে নদীর দিকে চেয়ে রইল। ভলগা তখন দীপ্তিহীন, ম্লান, নীরস, দেখতে ঠাণ্ডা. চারিদিকে বিষণ্ণ কনকনে শরতের আগমনীর সঙ্কেত। নদীতটের সুন্দর সবুজ আস্তরণ, সূর্যরশ্মির হিরকদ্যুতি, স্বচ্ছ নীল দিগন্ত — প্রকৃতির যা কিছু রম্যদৃশ্য মনে হচ্ছে সবই যেন ভলগা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সিন্দুকে পুরে রেখে দেওয়া হয়েছে আগামী বসন্ত পর্যন্ত। কাকগুলো নদীর উপর উড়ে উড়ে চিৎকার করে ওকে জ্বালিয়ে মারছে: 'ফাঁকা! ফাঁকা!' রিয়াবোভস্কি ওদের ডাক শুনছে আর মনে মনে বলছে, ওর আঁকা চিরকালের

মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে, ওর প্রতিভার মৃত্যু হয়েছে। এ জগতে সবকিছুই নেহাৎ মামুলি, আপেক্ষিক, বুদ্ধিহীন, এই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ওর উচিত হয়নি। এককথায়, ওর মধ্যে এসেছে নিরুৎসাহ ও অবসাদ।

দেয়ালের অপর পারে বিছানার উপর বসে আছে ওলগা ইভানভনা। সুন্দর রেশমী চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে কল্পনায় ও নিজেকে দেখছে ওদের ড্রয়িংরুমে, শোবার ঘরে, স্বামীর পড়ার ঘরে। মনে মনে ও চলে যাচ্ছে ওর দর্জির ঘরে, খ্যাতিমান বন্ধুদের কাছে। কী করছে তারা এখন? ওরা কি ওর কথা কখনো ভাবে? 'সীজন' শুরু হয়ে গিয়েছে, বুধবারের সন্ধ্যাগুলোর কথা ভাবার সময় হয়েছে। আর দীমভ? প্রিয় দীমভ! কী বিনম্র শিশুসুলভ অনুযোগের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখছে ও। প্রতিমাসে পঁচাত্তর রুবল করে পাঠাচ্ছে। তাছাড়া ওলগা ইভানভনা যখন জানাল যে শিল্পী বন্ধুদের কাছ থেকে ওকে একশ রুবল ধার করতে হয়েছে, দীমভ আরও একশ রুবল পাঠিয়ে দিয়েছিল। কী সৎ ও উদার মানুষ। এই ভ্রমণ ওলগা ইভানভনাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। একঘেয়ে লাগছে ওর। এইসব কৃষক আর নদীর ভ্যাপ্‌সা গন্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের কুটিরে থাকার আর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময় সর্বদাই যে শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সে বোধ করে এসেছে সেটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সে হয়ে উঠেছে আকুল। রিয়াবোভস্কি যদি শিল্পীদের কাছে বিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থেকে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি না দিত, ওলগা ইভানভনা সেইদিনই যেত চলে। কী ভালই না হত!

'ওঃ ভগবান!' রিয়াবোভস্কি গুমরে উঠল, 'সূর্য কি উঠবে না? সূর্য না উঠলে সূর্যোজ্জ্বল ল্যান্ডস্কেপগুলো আঁকব কী করে?'

'মেঘলা আকাশের স্কেচ তো একটা আছে তোমার,' দেয়ালের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ওলগা ইভানভনা বলল, 'মনে নেই, সেই যে ডানদিকে একটা বন আর একপাল গরু আর হাঁস। সেইটা এখন শেষ করে ফেল না।'

'ঈশ্বরের দোহাই,' বিরক্তিকর মুখভঙ্গী করে শিল্পী বলে উঠল, 'শেষ করে ফেল না! তুমি কি মনে কর আমি এতই বোকা যে কী করতে হবে তাও জানি না?'

'তুমি কী রকম বদলে গেছ।' ওলগা ইভানভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ভালই হয়েছে।'

ওলগা ইভানভনার সারা মুখ উঠল কেঁপে। স্টোভের পাশে সরে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

'শুরু হল কান্না! চুপ কর! আমারও কাঁদার মতো হাজারটা কারণ আছে, কই আমি তো কাঁদি না।'

'হাজারটা কারণ,' ওলগা ইভানভনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'সব থেকে বড় কারণ হল আমার উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে তোমার। হ্যাঁ তাই!' ওর কান্না, বেড়ে চলল, 'আসল কথাটা আমাদের প্রেম নিয়ে তুমি লজ্জা পাচ্ছ। শিল্পীরা পাছে জেনে ফেলে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, অথচ এর মধ্যে লুকোচুরির কিছুই নেই, তাছাড়া ওরা অনেকদিন ধরেই একথা জানে।'

বুকের উপর হাত রেখে অনুনয়ের সুরে শিল্পী বলল, 'ওলগা, আমি শুধু একটা অনুরোধ করছি, আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছে আর কিছুই চাই না আমি।'

'কিন্তু শপথ কর যে আমাকে ভালোবাসবে!'

'ওঃ, কী যন্ত্রণা!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে কথাগুলো বলে রিয়াবোভস্কি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'হয় ভলগায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দেব, নয়ত পাগল হয়ে যাব। চলে যাও এখান থেকে।'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে,' চিৎকার করে উঠল ওলগা ইভানভনা, 'মেরে ফেল আমাকে!'

কান্নায় ফেটে পড়ে দেয়ালের পিছনে চলে গেল ও। খড়ের চালের উপর ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। দুহাতে মাথা চেপে ধরে রিয়াবোভস্কি কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগল। খানিক পরে ওর মুখে স্থির সংকল্পের আভাস ফুটে উঠল যেন কারুর সঙ্গে তর্কের জবাব দিচ্ছে। টুপিটা মাথায় দিয়ে, বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ও চলে যাওয়ার পর ওলগা ইভানভনা অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদল। প্রথমটা ঠিক করল বিষ খেলে ভালো হত, রিয়াবোভস্কি ফিরে এসে দেখবে ও মরে গেছে। কিন্তু একটু পরে ওর কল্পনা ওকে নিয়ে গেল ওদের ড্রয়িংরুমে, স্বামীর পড়ার ঘরে, সেখানে ও যেন দীমভের পাশে বসে বসে শারীরিক শান্তি ও পরিচ্ছন্নতা উপভোগ করছে, পরক্ষণেই, যেন থিয়েটারে

বসে মার্জানির গান শুনছে। সহরের সভ্যতা, সহরের কোলাহল খ্যাতিমানদের প্রতি আকর্ষণে ওর বুকটা টন টন করে উঠল।

একটি গ্রাম্য মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল, মন্থর গতিতে স্টোভ ধরিয়ে সে ডিনার তৈরি করতে লেগে গেল। পোড়া কাঠের গন্ধ আসছে, ধোঁয়ায় বাতাস নীল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে কাদাভরা উঁচু বুট পায়ে বৃষ্টিতে মুখ ভিজিয়ে শিল্পীরা আসতে লাগল। পরস্পরের স্কেচগুলো পরীক্ষা করে ওরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিল যে খারাপ আবহাওয়াতেও ভলগার নিজের সৌন্দর্য আছে। সস্তা দেয়ালঘড়িটা বেজে চলেছে টিক্-টিক্-টিক্। বিগ্রহগুলির ওপাশে কোনের দিকে কতকগুলো মাছির ভন্ভনানি শোনা যাচ্ছে। তাদের শীত করছে। কয়েকটা আরশোলা বেঞ্চের তলায় মোটা মোটা ফাইলগুলোর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রিয়াবোভস্কি ফিরল সূর্যাস্তের সময়—ক্লান্ত, বিবর্ণ হয়ে। টুপিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে কাদামাখা বুট পরেই বেঞ্চে বসে চোখ বুজল।

'আমি ক্লান্ত। চোখের পাতা খোলার চেষ্টায় ওর ভুরুদুটো উঠল কুঁচকে।

সহানুভূতি আকর্ষণের আকাংক্ষায় এবং ও যে সত্যি সত্যি রাগ করেনি এইটা দেখানর জন্য ওলগা ইভানভনা রিয়াবোভস্কির দিকে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে তাকে চুম্বন করল। তারপর একটা চিরুণী দিয়ে শাদা রেশমের মতো চুল একবার স্পর্শ করল। চুল আঁচড়ানোর ইচ্ছাটা হঠাৎ তার মনে জেগেছে।

'ব্যাপার কী?' রিয়াবোভস্কি চম্‌কে চোখ খুলল, যেন কী একটা ঠাণ্ডা জিনিস তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। 'কী হচ্ছে কী? দয়া করে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

ওলগা ইভানভনাকে ঠেলে দিয়ে ও সরে গেল, মনে হল চোখে মুখে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ছাপ। ঠিক সেই সময় গ্রাম্য মেয়েটি সাবধানে দু'হাতে বাঁধাকপির সুপের পাত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওলগা ইভানভনা দেখল ওর মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো সুপে ভিজে গিয়েছে। পেটের উপর শক্ত করে বাঁধা স্কার্ট পরা এই নোংরা মেয়েটা, বাঁধা কপির সুপ, সেই সুপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া রিয়াবোভস্কি, এই কুটির, সব মিলে এই যে জীবন, যে জীবনের সরলতা, আর্টিস্টিক অগোছালো ভাব প্রথম প্রথম কী ভালই না লেগেছিল, আজ মনে হল ভয়ংকর। হঠাৎ অপমানিত বোধ করে নীরস কণ্ঠে ওলগা ইভানভনা বলল:

'কিছুদিনের জন্য আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তা নাহলে স্রেফ্ একঘেয়েমির ফলে আমরা দারুণ ঝগড়া করব। বিরক্তি ধরে গেছে আমার। আমি আজই চলে যাব।'

'কী করে যাবে? ঝাঁটায় চেপে?'

'আজ বৃহস্পতিবার, তাই সাড়ে ন'টার সময় স্টীমার আসবে।'

'তাই নাকি? ও, হ্যাঁ ...বেশ যাও,' ন্যাপকিনের অভাবে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মৃদুস্বরে রিয়াবোভস্কি বলল, 'এখানে তোমার একঘেয়ে লাগছে এবং করার কিছু নেই, আর আমিও এত স্বার্থপর নই যে তোমায় আটকে রাখব। আচ্ছা, কুড়ি তারিখের পর আবার দেখা হবে।'

ওলগা ইভানভনা হালকা মনে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। এমন কি খুশিতে ওর গাল দুটো চক্‌চক্ করছে। 'সত্যিই কি আবার নিজের ড্রয়িংরুমে বসতে পারবো? আঁকতে পারবো? নিজের শোয়ার ঘরে ঘুমোতে পারবো, পারবো কাপড়ে ঢাকা টেবিলে বসে খেতে?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে। মনে হচ্ছে ওর কাঁধ থেকে যেন একটা ভার নেমে গেছে। রিয়াবোভস্কির উপর আর কোন রাগ ওর নেই।

'রিয়াবুসা, আমার রং আর তুলিগুলো রেখে গেলাম,' ও হাঁক দিয়ে বলল, 'যদি কিছু বাকি থাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পার ... আমি চলে গেলে আলসেমি কোরো না যেন, কাজ করবে কিন্তু; আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না, বুঝলে লক্ষ্মী ছেলে, রিয়াবুসা।'

ন'টার সময় রিয়াবোভস্কি ওকে বিদায় চুম্বন দিল। ওলগা ইভানভনা বুঝল, ডেকের উপর শিল্পীদের সামনে এ কাজটি ও করতে চায় না। স্টীমারঘাট পর্যন্ত ওলগা ইভানভনাকে ও পোঁছেও দিল। একটু পরেই স্টীমার দেখা গেল। ওলগা ইভানভনা গেল চলে।

আড়াই দিনেই ও বাড়ি পোঁছল। টুপি বর্ষাতি না খুলেই উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে ড্রয়িংরুমে ঢুকল, সেখান থেকে গেল খাওয়ার ঘরে। দীমভ টেবিলে বসেছিল—সার্ট পরা, ওয়েস্টকোটের বোতাম খোলা, একটা কাঁটায় ছুরি শান দিচ্ছে, সামনে প্লেটের উপর একটা রোস্টকরা বন মোরগ।

বাড়িতে ঢোকার সময় ওলগা ইভানভনা স্থির সংকল্প করেছিল যে স্বামীর কাছে সব চেপে যাবে। এ কাজ যে সে পারবে, সে বিশ্বাসও ওর ছিল।

কিন্তু দীমভের সরল, বিনম্র ও সানন্দ হাসি আর খুশিতে জবলজবলে চোখ দেখে ওর মনে হল, এরকম একটা মানুষকে ছলনা করা কুৎসা, চুরি বা খুন করার মতো শুধু জঘন্য নীচতা নয়, অসম্ভব, ওর শক্তির বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করল, যা কিছু ঘটেছে সব দীমভকে বলবে। দীমভ ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার পর ওলগা ইভানভনা ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল।

'একি! কী হয়েছে, আমাকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল?' সস্নেহে দীমভ তাকে জিজ্ঞেস করল।

লজ্জায় লাল হয়ে মুখ তুলে দীমভের দিকে অপরাধীর অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল। কিন্তু ভয় ও লজ্জায় সত্যকথা বলতে পারল না।

'না, কিছু না ... আমি একটু ...'

'এস আমরা বসি,' দীমভ ওকে তুলে টেবিলে বসিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে ... নাও, একটু খাও, তোমার খিদে পেয়েছে।'

ওলগা ইভানভনা সাগ্রহে পরিচিত আবহাওয়ায় নিশ্বাস টানল, তারপর খানিকটা বন মোরগ খেল। আনন্দে হাসতে হাসতে দীমভ ওর দিকে সস্নেহে রইল তাকিয়ে।

৪

শীতের প্রায় মাঝামাঝি একসময় দীমভ বুঝতে পারল ও প্রতারিত হচ্ছে। স্ত্রীর চোখে চোখে ও আর তাকাতে পারে না—যেন ওর নিজের বিবেকই পরিচ্ছন্ন নয়। দেখা হলে সেই আনন্দের হাসিও আর আসে না। ওলগা ইভানভনার সঙ্গে একলা থাকা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই ডিনারের সময় ওর বন্ধু করস্তেলেভকে ও বাড়ি নিয়ে আসে। লোকটি ছোট্টখাট্ট, কদমছাঁট চুল, কুঞ্চিত মুখ। ওলগা ইভানভনা কথা বললেই বেচারা লজ্জায় কোটের বোতামগুলো একবার খোলে একবার বন্ধ করে, আর ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফ পাকায়। ডিনারের সময় দুই ডাক্তারে আলোচনা হয়—ডায়াফ্রামটা বেশি উঁচু হলে সময় সময় কীরকম বুক ধড়ফড় করে, সম্প্রতি স্নায়বিক রোগ কীরকম বেড়ে গিয়েছে, কিংবা আগের দিন একটি 'পারনিসাস্ এ্যানিমিয়া' রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে দীমভ কেমন করে আবিষ্কার করেছে যে আসলে রোগীটির হয়েছিল প্যাঙক্রিয়াসের ক্যানসার। ওরা

এমনভাবে চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা চালায় যাতে ওলগা ইভানভনা কোন কথা বলারে, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলার সুযোগ না পায়। ডিনারের পর করস্তেলেভ পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে, আর দীমভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে:

'কই হে বন্ধু, দেরী করছ কেন? একটা বিষণ্ণ মধুর কিছু শোনাও!'

কাঁধটা উঁচু করে আঙুলগুলো খেলিয়ে কয়েকটা ঝঙ্কার তুলে চড়া সুরে করস্তেলেভ গাইতে থাকে: 'আমাদের দেশে এমন একটা জায়গা দেখাও যেখানে রুশী চাষীরা আর্তনাদ করে না!'

আর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের মুঠিতে মাথা রেখে দীমভ চিন্তায় ডুবে যায়।

ওলগা ইভানভনা ইতিমধ্যে অত্যন্ত অসাবধান হয়ে উঠেছে। রোজ সকালে ঘুম ভাঙে বিশ্রী মেজাজে। মনে হয় রিয়াবোভস্কিকে বুঝি আর ভালবাসে না, ওদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝি চুকে গেছে। কিন্তু এক কাপ কফি খাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়ে যায় রিয়াবোভস্কি ওর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে, এখন ওর স্বামীও নেই, রিয়াবোভস্কিও নেই। আবার মনে পড়ে যায় ওর বন্ধুরা বলছিল রিয়াবোভস্কি নাকি প্রদর্শনীর জন্য একটা অপূর্ব ছবি আঁকছে, ছবিখানা পলেনভ্ স্টাইলের দৃশ্যপট ও সমস্যামূলক অঙ্কনের সংমিশ্রন, যারাই স্টুডিওতে যাচ্ছে, সবাই নাকি মুগ্ধ! ওলগা ইভানভনা ভাবে রিয়াবোভস্কি এ ছবি আঁকতে পেরেছে শুধু ওর প্রভাবে, ওরই প্রভাবে রিয়াবোভস্কির এই উন্নতি। সে প্রভাব এত কল্যাণময়, এত বাস্তব যে এখন ওলগা ইভানভনা ওকে পরিত্যাগ করলে ও হয়ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাছাড়া মনে পড়ে যায় গতবার ও যখন দেখা করতে এসেছিল, ওর পরনে ছিল রুপোলি সুতোর কাজ করা ছাই রংএর কোট আর একটা নতুন টাই এবং ক্লান্ত গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে?' সত্যিই ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, চমৎকার কোট, লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুল, নীল চোখ (অন্তত ওর তাই মনে হয়েছিল)। ওলগা ইভানভনার প্রতি সে অনুরাগও দেখিয়েছিলো।

এইসব এবং আরও অনেককিছু মনে করে, এবং তাই থেকে সিদ্ধান্ত টেনে ওলগা ইভানভনা সাজসজ্জা করে উত্তেজিত অবস্থায় রিয়াবোভস্কির স্টুডিওতে হাজির হল। শিল্পীকে প্রায়ই খোস্‌মেজাজে নিজের ছবি সম্পর্কে গর্ব

করতে দেখা যায়। ছবিখানা চমৎকার। মেজাজ ভাল থাকলে ও ভাঁড়ামি করে হাসিঠাট্টা করে গুরুতর প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। ওলগা ইভানভনা কিন্তু ছবিখানাকে হিংসা করে, দু চক্ষে দেখতে পারে না। তা সত্ত্বেও প্রতিবারই মিনিট পাঁচেক ধরে নীরব বিনয়ে ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে দেবমূর্তির সামনে মানুষ যেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেইরকম দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে:

'তুমি আগে কখনো এমনটি আঁকনি। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে।'

তারপরই রিয়াবোভস্কির কাছে মিনতি জানায় সে যেন ওকে ভালোবাসে, যেন ওকে পরিত্যাগ না করে, যেন ওর মত অসুখী বেচারার প্রতি অনুকম্পা দেখায়। ও কাঁদে, রিয়াবোভস্কির হাত ধরে চুম্বন করে, ওকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের করে চেষ্টা, প্রমাণ করে যে ওর প্রভাব না থাকলে রিয়াবোভস্কি পথচ্যুত হবে, হারিয়ে যাবে। এইভাবে শিল্পীর মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে এবং নিজেকে হীন করে ও চলে যায় দর্জির কাছে কিংবা কোন অভিনেত্রী বান্ধবীর কাছে থিয়েটারের টিকিটের খোঁজে।

যেদিন স্টুডিওতে রিয়াবোভস্কির দেখা পাওয়া যায় না, ও ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে রেখে আসে, রিয়াবোভস্কি যদি সেইদিনই ওর সঙ্গে দেখা না করে ও তাহলে বিষ খাবে। ভয় পেয়ে রিয়াবোভস্কিকে যেতে হয়, ডিনার পর্যন্ত হয় থাকতে। দীমভের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করে ওরা পরস্পরকে অপমানসূচক কথা বলে। দুজনেই অনুভব করে, ওরা পরস্পরের পথের কাঁটা, উৎপীড়ক, শত্রু। ফলে ওরা রাগে এমনি জ্বলে যে নিজেদের অশিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। এমনকি কদমছাঁট করস্তেলেভের কাছেও ওদের ব্যাপারটা আর চাপা থাকে না। ডিনারের পর রিয়াবোভস্কি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যায় চলে।

'কোথায় যাচ্ছ?' হলঘরে এসে ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করে।

ভুরুটা কুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে রিয়াবোভস্কি হয়ত এমন কোন মহিলার নাম করে যাকে ওরা দুজনেই চেনে। স্পষ্টই বোঝা যায় ওলগার ঈর্ষা নিয়ে ও মজা করছে, ওকে চটাবার চেষ্টা করছে। ও চলে গেলে ওলগা ইভানভনা শোবার ঘরে গিয়ে এলিয়ে পড়ে। রাগে, ঈর্ষায়, লজ্জায়, অপমানে ও বালিশ কামড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোঁপাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত করস্তেলেভকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দীমভ বিব্রত ও লজ্জিত মুখে ঘরে ঢোকে।

'কেঁদ না। কী লাভ বল? এসব ব্যাপারে চুপচাপ থাকাই ভাল... জানাজানি হওয়া উচিত নয় ... যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না,' দীমভ মৃদুস্বরে বলে।

দারুণ ঈর্ষা দমন করতে না পেরে ওলগা ইভানভনার রগদুটো দপ্ দপ্ করতে থাকে। হয়ত সবকিছু এখনো আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি এই ভেবে ও উঠে মুখ ধুয়ে অশ্রুসিক্ত মুখে পাউডার দেয়, এবং পরক্ষণেই রিয়াবোভস্কি যে মেয়েটির নাম বলেছিল তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে রিয়াবোভস্কিকে না পেয়ে যায় অপর কারও বাড়ি, সেখান থেকে অন্য কোথাও। প্রথম প্রথম এইভাবে ঘোরাঘুরি করতে ওর লজ্জা করত, কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গেল। সময় সময় এমনও হয় যে হয়ত এক সন্ধ্যায় ওর জানাশোনা সব মেয়ের বাড়িই রিয়াবোভস্কির খোঁজে ঘোরে এবং তারা সকলেই ওর উদ্দেশ্য পারে বুঝতে।

একদিন ওলগা ইভানভনা রিয়াবোভস্কির কাছে ওর স্বামীর সম্পর্কে বলল, 'এই লোকটি উদারতা দেখিয়ে আমার উপর নির্যাতন করে।'

কথাটা বলতে ওর এত ভাল লাগে যে শিল্পী মহলে যারা ওর আর রিয়াবোভস্কির গোপন ব্যাপারটা জানত তাদের সঙ্গে দেখা হলেই খুব জোরের সঙ্গে হাত নেড়ে ও স্বামীর সম্পর্কে বলে:

'এই লোকটি উদারতা দেখিয়ে আমার উপর নির্যাতন করে।'

ওদের জীবন যাত্রা আগের মতোই চলতে থাকে। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়িতেই অতিথি সমাগম হয়। অভিনেতা আবৃত্তি করেন, শিল্পীরা আঁকেন, বেহালা বাদক বাজনা বাজান, গায়ক গান গান, এবং ঠিক সাড়ে এগারটায় সময় খাওয়ার ঘরের দরজা খুলে যায় আর হাসি হাসি মুখে দীমভ ডাক দেয়, 'ভদ্রমহোদয়গণ! খাবার প্রস্তুত।'

আগের মতোই ওলগা ইভানভনা বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের খুঁজে বের করে এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অন্যদের সন্ধান করে। একইভাবে প্রতিরাতেই ও দেরী করে বাড়ি ফেরে, কিন্তু আগের মতো দীমভ আজকাল আর ঘুমিয়ে পড়ে না, পড়ার ঘরে বসে কিছু একটা কাজ করে। রাতে তিনটায় সে শুতে যায় আর ওঠে আটটার সময়।

'তা বটে, কেউ বিচার করবে না।' আনিসিম বলল নিঃশ্বাস ফেলে, 'কেউ জিগ্যেস করবে না মা, কেননা ঈশ্বর বলেই যে কেউ নেই।'

ভারভারা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইল, তারপর দুহাত ছড়িয়ে হেসে উঠল হো হো করে। ভারভারার এই অকপট বিস্ময় দেখে অস্বস্তি লাগল আনিসিমের। যেভাবে সে চাইছিল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভারভারা আনিসিমকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।

আনিসিম বলল, 'মানে, হয়ত ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, কিন্তু লোকে আর তাকে বিশ্বাস করে না। আমার যখন বিয়ে হচ্ছিল তখন ভারি অদ্ভুত লাগছিল। মুরগীর বাসা থেকে ডিমটা নিয়ে এসেছি, হঠাৎ যেমন ডিমের মধ্যে বাচ্চাটা কোঁ কোঁ করে ওঠে, আমার বিবেকটাও তেমনি যেন কোঁকোঁ করে উঠল। ওদিকে বিয়ে চলছে আর আমি ভাবছি: ভগবান বলে নিশ্চয়ই কেউ আছেন! কিন্তু যেই গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলাম, অমনি আর কিছুই নেই। ভগবান আছেন কি নেই কী করেই বা তা বোঝা যাবে? ছেলেবেলায় এসব কথা কেউই আমাদের শেখায়নি। মায়ের দুধ খেতে খেতেই আমরা শুনতে শুরু করেছি, যে যার পাওনা বুঝে নাও। বাবাও তেমন ভগবানে বিশ্বাস করেন না। মনে আছে আপনার, সেই যে একবার গুনতারেভদের বাড়ি থেকে ভেড়া চুরি যাবার কথা বলেছিলেন? ব্যাপারটা আমি সব বার করেছি। শিকালভোর একটা চাষা চুরি করেছিল; হ্যাঁ, ওই লোকটাই চুরি করেছিল বটে, কিন্তু চামড়াগুলো সব এসে জমা হয়েছে আমার বাবার দোকানে ... এই তো আপনার ধম্ম!'

আনিসিম চোখ মটকে মাথা নাড়ল। বলল, 'ভোলোস্তের মাতব্বরও ভগবানে বিশ্বাস করে না। কেরানীটিও নয়, সেক্সটনও নয়। গীর্জায় ওরা যে যায়, কিংবা পালাপার্বনে যে উপোস করে তার কারণ লোকে যাতে নিন্দে না করে, সত্যিই যদি শেষ বিচারের দিন কখনো এসে পড়ে সেই ভয়ে। কেউ কেউ বলে, দুনিয়াটার অন্তিমকাল এসে পড়ল বলে, কেননা লোকে আজকাল বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে, বাপ-মাকে সম্মান করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সব নেহাৎ বাজে কথা। আমার ধারণা কি জানেন মা? লোকের কোনো বিবেক নেই, আর, সেই হল আমাদের যত দুঃখকষ্টের গোড়া। লোকের আগাপাছতলা আমি দেখতে পাই, লোক চিনতে আমার বাকি নেই। যে কোনো একটা

সার্ট দেখেই আমি বলে দেব সার্টটা চোরাই মাল কিনা। সরাইখানায় একটা লোক বসে আছে; তুমি ভাবছ লোকটা বুঝি বসে বসে চা খাচ্ছে, কিন্তু আমি ঠিক টের পাই, লোকটা চা খাচ্ছে শুধু নয়, লোকটার কোনো বিবেকও নেই। সারাদিন ঘুরে ঘুরেও এমন একটা লোক পাবে না, যার বিবেক বলে কিছু আছে। তার কারণ ভগবান আছেন কি নেই কেউ জানেই না . . আচ্ছা, মা, তাহলে আসি। শরীর ভালো রাখবেন, মন ভালো থাক আপনার। আমাকে মনে রাখবেন।'

ভারভারার সামনে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করল আনিসিম। বলল, 'আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, মা। আমাদের সংসারের আপনি লক্ষ্মী, ভারি পুণ্যবতী নারী আপনি। আপনাকে ভারি ভালো লাগছে আমার।'

অতি বিচলিত হয়ে আনিসিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল:

'সামরোদভ আমাকে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে ফাঁসিয়েছে যে হয় মরব, নয় খুব বড়োলোক হয়ে যাবো। খারাপ যদি কিছু হয়, তাহলে বাবাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন মা, কেমন?'

'ছি, ওসব কথা মুখে এনো না আনিসিম, ভগবান রক্ষা করবেন! তোমার বউকে তুমি আদর করলে ভালো হত। কিন্তু তোমরা দুজন দুজনের দিকে এমনভাবে তাকাও যেন বুনো জানোয়ার দুটো। একটু হাসতে দেখি না তোমাদের, কই একটুও হাসো না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনিসিম বলল, 'ও বড়ো অদ্ভুত মেয়ে। কিছু বোঝে না, কোনো কথাই বলে না। বড়ো অল্প বয়স, আর একটু বড়ো হোক।'

গাড়িবারান্দার কাছে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আনিসিমের জন্যে। লম্বা নধর ঘোড়াটা গাড়িতে জোতা।

বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন বেশ ফুর্তির চালে লাফিয়ে গাড়িতে চেপে লাগাম হাতে নিল। ভারভারা, আকসিনিয়া আর ভাইকে চুমু দিল আনিসিম। বারান্দার ওপর লিপাও দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে, অন্যদিকে চেয়ে। যেন তার স্বামীকে সে বিদায় দিতে আসেনি, যেন পায়চারি করতে করতে এমনি এসে পড়েছে। আনিসিম কাছে গিয়ে আলগোছে তার গালে ঠোঁট রাখল। বলল, 'আসি।'

আনিসিমের দিকে লিপা চাইল না, শুধু একটা বিচিত্র হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল, শরীরটা কেঁপে উঠল একটু। মেয়েটির জন্যে সকলেরই কেমন একটা কষ্ট হল, কেন কে জানে। গাড়ির ভেতর আনিসিম লাফিয়ে উঠে বসল কোমরে হাত দিয়ে। তাকে যে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে মনে হল এ সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই।

গাড়িটা যখন নালা ছেড়ে ওপর দিকে উঠছে তখন আনিসিম গাঁ-টার দিকে ফিরে ফিরে দেখল। গরম রোদে ভরা দিন। এ বছরে এই প্রথম গরু ভেড়াগুলোকে চরাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মেয়ে বৌয়ের দল, গায়ে তাদের ছুটির দিনের সাজ। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে লাল রঙের একটা ষাঁড় মুক্তির উল্লাসে গর্জন করে উঠল সজোরে। চারিদিকে — ওপরে, নিচে ভরত পাখিগুলোর গান শুরু হয়ে গেছে। আনিসিম গীর্জাটার দিকে চেয়ে দেখল — সুঠাম, শাদা, সদ্য চুনকাম করা। আনিসিমের মনে ভেসে উঠল পাঁচ দিন আগে এই গীর্জাতে সে প্রার্থনা করেছে। সবুজ ছাতওয়ালা স্কুল ঘরটার দিকে তাকাল আনিসিম, তাকাল নদীটার দিকে — এইখানে সে কতো চান করেছে, মাছ ধরেছে। মনটা তার হঠাৎ ভারি একটা আনন্দে ভরে গেল। মনে মনে সে চাইল এই মুহূর্তে তার পথরোধ করে একটা দেয়াল উঠুক মাটি ফুঁড়ে, তাকে ছিন্ন করে আনুক সেইখানে, যেখানে সে আর তার অতীত ছাড়া আর কিছু নেই।

স্টেশনে পৌঁছে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে এক গ্লাস করে শেরি হল দুজনের। বুড়ো কর্তা দাম দেবার জন্যে পকেট থেকে টাকার থলি বার করতে গেলে আনিসিম বলল, 'আমি খাওয়াচ্ছি।'

তাতে বুড়ো কর্তার মনটা বেশ দুলে উঠল। আনিসিমের কাঁধে চাপড় মেরে সে বারের লোকটার দিকে চোখ মটকাল। যেন বলতে চাইল, 'দেখো, কেমন ছেলে আমার!'

আনিসিমকে সে বলল, 'আমি চাই, আনিসিম তুমি বাড়িতেই থাকো, আমার ব্যবসায়ে সাহায্য করো। তোমাকে পেলে আমার যে কী সুবিধা হয়! সোনা দিয়ে তোমাকে মুড়ে দিতে পারি তাহলে।'

'না বাবা, তা হয় না।'

শেরিটা টক। গন্ধ উঠছিল গালার মতো। তবু আর এক গ্লাস করে ওরা নিল।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে বুড়ো তার নতুন বৌমাটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্বামী চলে যাওয়া মাত্র লিপা বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক হাসিখুশি তরুণী। জীর্ণ একটি স্কার্ট পরে, হাতের ওপর আস্তিন গুটিয়ে খালি পায়ে লিপা বারান্দার সিঁড়ি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে, গান গাইছে চড়া রুপোলী গলায়। ময়লা জলের ভারি গামলাখানা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে যখন সূর্যের দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতো হাসল তখন সত্যি সত্যি মনে হল ও নিজেই বুঝি আর একটা ভরত পাখি।

গাড়িবারান্দার সামনে দিয়ে ঠিক সেই সময় একটা বুড়ো মজুর পেরিয়ে যাচ্ছিল। মাথা দুলিয়ে, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলল, 'ভগবান তোমাকে ভারি সুন্দর সুন্দর সব ব্যাটার বৌ দিয়েছে, গ্রিগরি পেত্রোভিচ। লক্ষ্মী প্রতিমা সবাই!'

৫

সেদিন ছিল আট-ই জুলাই। লিপা আর ইয়েলিজারভ, ওরফে 'পেরেক' কাজানস্কোয়ে গাঁয়ে গিয়েছিল ওখানকার গীর্জার অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুরাণী কাজান মাডোনার পরব উপলক্ষ্যে। ফিরছিল হেঁটে, লিপার মা প্রাস্কোভিয়া ছিল অনেকখানি পিছিয়ে। প্রাস্কোভিয়ার শরীর ভালো ছিল না বলে হাঁপাচ্ছিল। সন্ধে হয় হয়।

লিপার কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে 'পেরেক' বলছিল, 'ও-ও! তাই নাকি?'

লিপা বলছিল, 'ইলিয়া মাকারিচ, আমি জ্যাম খেতে খুব ভালোবাসি, তাই কোণের দিকে বসে আমি চা আর জ্যাম খাই। নয়ত ভারভারা নিকলায়েভনার সঙ্গে বসে চা খাই, উনি আমাকে সুন্দর আর করুণ গল্প বলেন। ওদের জ্যাম কতো আছে জানো, অঢেল—চার বয়াম! ওরা কেবলি বলে, 'খেয়ে নাও লিপা, যত পারো খাও!'

'তাই নাকি? চার বয়াম!'

'হ্যাঁ। ওরা তো বড়োলোক—চায়ের সঙ্গে শাদা রুটি খায় ওরা, আর

যতো ইচ্ছে ততো মাংস। ওরা বড়োলোক, কিন্তু সব সময় এত ভয় করে আমার, ইলিয়া মাকারিচ, এত ভয় ভয় লাগে!'

'ভয় কিসের বেটি?' 'পেরেক' বলল ঘাড় ফিরিয়ে, প্রাস্কোভিয়া কতদূর পিছিয়ে আছে দেখার জন্যে।

'বিয়ের পর, প্রথম প্রথম আমার ভয় লাগত আনিসিম গ্রিগরিচ্‌কে দেখে। লোক সে খারাপ নয়, আমার কোনো ক্ষতিও করেনি। কিন্তু ও কাছে এলেই আমার হাড় পর্যন্ত কেমন শিটিয়ে আসত। সারা রাত আমার ঘুম হত না, কাঁপতাম আর প্রার্থনা করতাম। তারপর এখন ভয় লাগে আকসিনিয়াকে দেখে, জানো ইলিয়া মাকারিচ! সত্যি বলতে, সেও খারাপ নয়, সব সময়েই মুখে তার হাসি লেগে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে যখন জানলা দিয়ে তাকায়, তখন তার চোখ দুটো কেমন ভয়ঙ্কর লাগে, অন্ধকার গোয়ালের মধ্যে ভেড়ার চোখগুলো যেমন জ্বলে তেমনি সবুজ হয়ে ঝক্ ঝক্ করে ওর চোখ দুটো। খ্রিমিনদের ছোটো তরফ সব সময়েই ওর পেছনে লেগে আছে। ক্রমাগত তাকে ওরা বলে, "বুতেকিনোতে তোমাদের বুড়ো কর্তার একটা জমি আছে, গোটা চল্লিশ দেসিয়াতিনের মতো হবে। মাটি বলতে সবটাই প্রায় বালি — কাছেই নদীও আছে। ওখানে তুমি নিজের নামে একটা ইঁটখোলা তৈরি করো না কেন আকসিনিয়া। আমরাও তোমার সঙ্গে অংশীদার থাকব।" আজকাল ইঁটের দাম বিশ রুবলে হাজার। ওরা একেবারে লাল হয়ে যাবে। গতকাল দুপুরের খাওয়ার সময় আকসিনিয়া বুড়ো কর্তাকে বলেছে, 'বুতেকিনোতে আমি একটা ইঁটখোলা করে নিজের নামেই ব্যবসা শুরু করব ভাবছি।" আকসিনিয়া বেশ হেসে হেসেই বলল। কিন্তু গ্রিগরি পেত্রোভিচের মুখ একেবারে হাঁড়ি হয়ে গেল। দেখেই বোঝা গেল ওর মত নেই। বলল, "আমি যতোদিন বেঁচে আছি, পৃথক হয়ে ব্যবসা করা চলবে না। একত্র হয়েই আমাদের চলতে হবে।" আকসিনিয়া এমনভাবে চাইল, এমন করে দাঁত কড়মড় করল ... পাতে যখন লুচি দেওয়া হল তার একটিও ছুঁল না।'

'বটে?' 'পেরেক' অবাক হল, 'একটা লুচি ছুঁল না?'

লিপা বলে চলল, 'আর কখন যে ও ঘুমোয়, আমি এখনো টের পেলাম না। আধ ঘণ্টাখানেক শুয়েছে কি অমনি উঠে পড়ে শুরু হয়ে গেল পায়চারি।

এ কোণ ও কোণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখবে চাষাভুষোরা কিছু চুরি করল কি কিছুতে আগুন দিল কিনা। ওকে দেখে আমার ভারি ভয় করে, ইলিয়া মাকারিচ! আর জানো, সেদিন বিয়ের পর খুমিন ছোটো তরফেরা তো আর ঘুমতে যায়নি, সোজা চলে গিয়েছিল শহরের আদালতে। লোকে বলে, এসব আর্কাসিনিয়ার দোষ। ওদের তিন ভাইয়ের দুই ভাই কথা দিয়েছিল আর্কাসিনিয়ার জন্যে একটা কারখানা বানিয়ে দেবে। কিন্তু বাকি ভাইটা রাগারাগি করল। তাই ওদের কারখানাটা মাসখানেক ধরে বন্ধ হয়ে রইল। আমার কাকা প্রখোরকে বেকার হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হল ভিক্ষে করে। বললাম, গাঁয়ে গিয়ে চাষ আবাদের বা কাঠ কাটার কাজে লাগো না কেন, কাকা? সে বলল, "সৎচাষীর মতো কাজ করতে কবে ভুলে গিয়েছি রে লিপা, চাষ আবাদের কাজ আর আমার হবে না।"'

এ্যাস্পেন ঝোপটার কাছে ওরা জিরিয়ে নেবার জন্যে বসল। ইতিমধ্যে প্রাস্কোভিয়াও এসে ওদের ধরতে পারবে। ঠিকাদার হিসেবে ইয়েলিজারভ কাজ করছে অনেকদিন কিন্তু ঘোড়া রাখে না সে। সারা জেলাটা সে চক্কর দিয়ে বেড়ায় পায়ে হেঁটে। সঙ্গে থাকে পেঁয়াজ আর রুটিভরা একটা ঝোলা। লম্বা লম্বা পা ফেলে হনহনিয়ে চলে, দুপাশে হাত দুটো দোলে। হেঁটে ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

ঝোপটার ধারে বিভিন্ন সম্পত্তির সীমা নির্দেশক একটা শিলা। ইয়েলিজারভ পরখ করে দেখল, জিনিসটা যতোটা শক্ত দেখাচ্ছে আসলে ঠিক ততোটা শক্ত কিনা। ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রাস্কোভিয়া ওদের সঙ্গ ধরল। তার শুকনো সদা শঙ্কিত মুখখানা কিন্তু এখন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। সবাইকার মতো সেও গিয়েছে গীর্জের ভেতরে, সবাইকার মতো সেও মেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে আর 'ক্ভাস' খেয়েছে। এরকম ঘটনা তার জীবনে ঘটেনি, সুখের দিন বলতে জীবনে এই একটি দিনই সে পেল বলে তার মনে হল। বিশ্রামের পর তিনজনই হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনভূমির ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে, গাছের গুঁড়িগুলো তাতে আলো হয়ে উঠেছে। সামনের কোনো একটা দিক থেকে গুঞ্জন আসছে ভেসে ভেসে। উকলেয়েভোর মেয়েরা অনেকটা আগিয়েছিল। বনভূমির মধ্যে ব্যাঙের ছাতা খোঁজার জন্যে সম্ভবত তারাই দেরি করছে এখনো

ইয়েলিজারভ ডাকল, 'ওগো মেয়েরা! ওগো সুন্দরীরা!'

ইয়েলিজারভের ডাক শুনে হাসির হররা ভেসে এল।

'পেরেক আসছে রে! বুড়ো ব্যাঙ, পেরেক।'

হাসি ভেসে এল প্রতিধ্বনি থেকেও।

বনভূমি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল কারখানার চিমনির ডগাগুলো, গীর্জার মাথার ক্রস রোদে ঝকমক করছে: সেই গ্রাম, যেখানে সেক্সটন বুড়ো শ্রাদ্ধের ভোজে সবটা ক্যাভিয়ার খেয়ে ফেলেছিল। আর অল্প গেলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে ওরা; শুধু তার আগে বিরাট ঢালু বেয়ে নামতে হবে নিচে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া এতক্ষণ খালি পায়ে হাঁটছিল। এবার ওরা বসল বুট পরে নেবার জন্যে। ঠিকাদার ইয়েলিজারভ বসল তাদের পাশে ঘাসের ওপর। ওপর থেকে দেখল উকলেয়েভো গ্রামখানা, তার উইলো গাছের সারি, তার ধবধবে শাদা গীর্জা, আর ছোট নদীখানি সমেত বেশ ছবির মতো লাগে, বেশ শান্ত, নিভৃত। কেবল কারখানার ছাতটায় খরচ বাঁচানোর জন্যে যে ম্যাড়মেড়ে রঙ লাগানো হয়েছে তাতে সুর কেটে যায় কেমন। নালার অন্য পাড়ে দেখা যায় পাকা রাইয়ের বিশৃংখল স্তূপ — যেন ঝড় বয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রাই কাটা সদ্য শেষ হয়েছে সেখানে সেখানে সেগুলোকে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে ঘন ঘন। ওটের খেতও পেকে উঠেছে, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে মুক্তার মতো। ফসল কাটার কাজ পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনটা ছুটি গেল। কাল আবার সবাই রাই আর বিচালির ক্ষেতে গিয়ে জুটবে। তারপর দিনটা আবার ছুটি — রবিবার। আজকাল প্রত্যেক দিনই শোনা যায় কোথায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে। বাতাসটা গুমোট—শীগ্‌গিরই বোধহয় বৃষ্টি হবে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে ওরা প্রত্যেকেই ভাবছে, বৃষ্টির আগেই ফসল কাটার কাজটা মিটে গেলে ভালো। আর প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই একটা আনন্দ, ফুর্তি আর অস্থিরতা।

প্রাস্কোভিয়া বলল, 'খড় কাটুনিরা এবছর বেশ পয়সা করে নিচ্ছে। এক রুবল চল্লিশ কোপেক রোজ।'

অনবরত কাজানস্কোয়ের মেলা থেকে লোক ফিরছে পিলপিল করে— মেয়ের দল, নতুন টুপি পরা কারখানার মজুর, ভিখিরি, ছেলেপিলে…

খামারের গাড়ি গেল একটা একরাশ ধ্লো উড়িয়ে। গাড়ির পেছনে একটা ঘোড়া বাঁধা—বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বিক্রি হয়নি। মনে হল যেন তাতে ঘোড়াটা খ্শিই হয়ে উঠেছে। একটু পরেই একটা গর্কে নিয়ে যাওয়া হল শিঙ চেপে ধরে, গর্টা অনবরত ডাকছে। আর একটা গাড়ি গেল—একদল মাতাল চাষী তাতে চেপে আছে, ঠ্যাংগ্লো তারা ঝুলিয়ে দিয়েছে গাড়ির পাশ দিয়ে। একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে গেল একটা ব্ড়ি, ছেলেটার মাথায় একটা মস্ত টুপি, পায়ে প্রকান্ড প্রকান্ড ভারি ব্ট। অতো প্রকান্ড ব্ট পরায় হাঁটু বাঁকানোর উপায় নেই। তার ওপর গরম। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ছেলেটা, তব্ আপ্রাণ জোরে সে একটা খেলনার শিঙা বাজিয়ে চলেছে অনবরত। তারা ঢাল্ বেয়ে নেমে রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যাওয়ার পরেও শিঙার শব্দটা কানে এসে পেঁাছচ্ছিল।

ইয়েলিজারভ বলল, 'আমাদের মিল মালিকদের মাথায় কি যে ঢুকেছে! ভগবান বাঁচালে হয়। কস্তিউকোভ্ আমার ওপর চটেছে। বলে, "কার্ণিশের ওপর তুমি অনেক বেশি তক্তা লাগিয়েছো।" বললাম, অনেক বেশি কোথায়? যা দরকার তাই তো লাগিয়েছি ভাসিলি দানিলিচ্! আমি তো আর পরিজের সঙ্গে তক্তাগ্লো বেটে খেয়ে নেবো না। "তা বলে, আমার ম্খের ওপর অমন করে ম্খ করছ তুমি! আহাম্ম্ক কোথাকার, বড়ো বাড় বেড়েছ! তোমাকে ঠিকাদার বানিয়েছেটা কে? আমি?" আমি বললাম, তা বটে, কিন্তু কী হল তাতে? ঠিকাদার হবার আগেও আমার রোজ চা খাওয়া জ্টত। ও বলল "যতো সব জোচ্চোরের দল, সব বেটা জোচ্চোর..." আমি রা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এ দ্নিয়ায় আমরাই তো জোচ্চোর বটি, কিন্তু ওপরের দ্নিয়ায় জোচ্চোর হবে তোমরা! হায় রে! পরদিন অবিশ্যি আর তেমন মেজাজ গরম করল না ও। বলল, "যা বলেছি তার জন্যে রাগ কোরো না মাকারিচ, অন্যায় বলে থাকলে, সহ্য করে যেয়ো, কেননা হাজার হোক, মানমর্যাদায় আমি তো তোমার বড়ো, পয়লা নম্বরের একজন ব্যবসায়ী।" আমি বললাম, তা বটে, তুমি বড়ো আর পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী সে ঠিক, আর আমি একজন ছ্তোর। কিন্তু সেন্ট জোসেফও ছিল একজন ছ্তোর—এ কাজ খারাপ কাজ নয়—ভগবানের কাছে এ কাজটাও ভালো কাজ। আর তুমি যদি আমার চেয়ে বড়ো হয়ে থাকতে চাও, তো বেশ ভালো কথা। আর তারপরে ঐ কথাবার্তা

কয়ে আমি মনে মনে ভাবলাম: আমাদের মধ্যে কে আসলে বড়ো? পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী না কি এই ছুতোর মিস্ত্রি? ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসল বড়ো।'

'পেরেক' কী যেন ভাবল একটু। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ বাছা, ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসল বড়ো। যে মেহনত করে, সবকিছু সহ্য করে সেই হল বড়ো।'

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। নদী আর গীর্জার চত্বর আর কারখানার আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলো থেকে দুধের মতো শাদা ঘন একটা কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, নিচে মিটমিট করছে বাতিগুলো; মনে হচ্ছে যেন একটা অতলস্পর্শ শূন্যকে বুঝি কুয়াশা গোপন করে রাখতে চাইছে। ঠিক মুহূর্তে ক্ষণেকের জন্য লিপা আর তার মায়ের মনে হল বুঝি এই বিশাল দুর্জ্ঞেয় বিশ্বের মাঝখানে, জীবজগতের এই অসীম প্রাণধারার মধ্যে তাদেরও কিছু একটা মানে আছে, তারাও বড়ো। দারিদ্র্যের মধ্যে তারা জন্মেছে, সারা জীবন দারিদ্র্য সইবে বলে তাদের মন বাঁধা। অন্যের হাতে ওরা নিজেদের সব কিছু তুলে দিতেই অভ্যস্ত হয়েছে, শুধু নিজেদের ভীরু নম্র আত্মাটি ছাড়া। উপরে বসে বসে ওরা সময় কাটাল, মুখে ওদের জেগে রইল আনন্দের একটা হাসি আর কয়েক মুহূর্তের জন্য ওরা ভুলে গেল, এখুনি হোক কি পরে হোক নিচের উৎরাইয়ে ওদের নামতেই হবে।

ওরা যখন বাড়ি ফিরল তখন ফটকের পাশে আর দোকানের সামনে মাটির ওপর ফসল-কাটা মজুরেরা এসে বসেছে। উকলেয়েভো গাঁয়ের চাষীরা কেউ ৎসিবুকিনদের বাড়িতে মজুরি করতে আসে না। ক্ষেতমজুর জোগাড় করতে হয় অন্য গাঁ থেকে। ছড়িয়ে বসে আছে লোকগুলো, আবছা আলোয় মনে হচ্ছে ওদের সকলেরই মুখ ভরা বুঝি কালো কালো লম্বা দাড়ি। দোকানটা খোলা। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালা লোকটা একটা বাচ্চার সঙ্গে বসে ড্রাফ্‌ট্ খেলছে। ক্ষেতমজুরগুলো গান গাইছে এমন নরম গলায় যে প্রায় শোনাই যায় না। আর মাঝে মাঝে গান থামিয়ে আগের দিনের মজুরি দাবি করছে চেঁচিয়ে। মজুরি পেলে পাছে ওরা সকাল হবার আগেই চলে যায় এই ভয়ে ওদের মজুরি দেওয়া হয়নি। বারান্দার সামনেকার বার্চ গাছটার নিচে বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন আস্তিনওয়ালা সার্টখানি পরে চা খাচ্ছে আকসিনিয়ার সঙ্গে। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে একটি।

ফটকের ওপাশ থেকে বিদ্রুপের সুরে একজন ক্ষেতমজুর গান ধরল, 'দা-আ-আ-দু! আধখানা দেবে, তাই দিয়ো দাদু,তাই দিয়ো।'

একটু হাসি শোনা গেল, তারপর আস্তে, প্রায় শোনা যায় না এমন সুরে গান ধরল ওরা ... 'পেরেক' চা খাবার জন্যে টেবিলে এসে বসল।

সে বলতে সুরু করল, 'তারপরে তো আমরা মেলায় গিয়ে পেঁাছলাম। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের সময়টা বেশ ভালোই কাটল বাছারা, ভারি ভালো কাটল। তবে একটা ভারি খারাপ কান্ড হয়ে গেল। সাশা কামার তামাক কিনে দোকানীকে একটা আধুলি দিয়েছিল, দেখা গেল আধুলিটা জাল।' কথা বলতে বলতে 'পেরেক' চারিদিকটা একবার দেখে নিল। তার চেষ্টা ছিল ফিস্‌ফিস্ করে কথাটা বলবে, কিন্তু ভাঙা ভাঙা আধা-চাপা গলায় সে যা বলল তা কারুর কানে যেতে আর বাকি রইল না। 'দেখা গেল ওটা জাল। লোকে জিগ্যেস করল, "কোথায় পেলি এটা বল শীগ্‌গির।" সে বলল, "আনিসিম ৎসিবুকিনের কাছ থেকে, বিয়ের সময় আমাকে দিয়েছিল"... ওরা সবাই পুলিস ডেকে আনল, পুলিস লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল।... শোনো বলি পেত্রোভিচ্, তুমি আবার কোনো মুশকিলে না পড়ো। লোকে বলাবলি করছে...'

'দা-আ-আ-দু!' ফটকের কাছ থেকে সেই বিদ্রুপের স্বরটা ভেসে এল একবার, 'দা-আ-আ-দু!'

তারপরে সবাই চুপ করে গেল।

'পেরেক' বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আহ্ বাছারা, বাছারা ...' ওর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, 'চা আর চিনির জন্যে ধন্যবাদ বাছারা। ঘুমোবার সময় হয়ে এল। আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে বাছা, আমার শরীরের কড়ি বর্গাগুলো এবার ভেঙে ভেঙে পড়ছে। হো-হো!'

চলে যাবার আগে সে বলল:

'তার মানে এবার মরণের দিন ঘনিয়ে এল!' বলে ফুঁপিয়ে উঠল সে। বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন চা শেষ না করেই বসে বসে কী ভাবতে লাগল। রাস্তা দিয়ে 'পেরেক' অনেকটা দূর চলে গেছে ইতিমধ্যে। তবুও যেন সে তার পায়ের শব্দ শোনার জন্যেই কান পেতে আছে।

ৎসিবুকিন কী ভাবছে আন্দাজ করে আকসিনিয়া বলল, 'সাশা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছে।'

ৎসিবুকিন ঘরের ভেতর গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল একটা ছোট্ট মোড়ক নিয়ে। মোড়কটা খুলতে টেবিলের ওপর ঝকমকিয়ে উঠল নতুন রুবলগুলো। একটা রুবল তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে সে দেখল, তারপর ট্রের ওপর ফেলে দিল। তারপর আর একটা তুলে নিল এবং সেটাকেও ফেলে দিল ...

আকসিনিয়ার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বুড়ো বলল, 'টাকাগুলো সত্যিই জাল ... এ হল সেই রুবলগুলো, আনিসিম প্রণামী হিসেবে দিয়েছিল। এই, নাও বাছা,' বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও গে ... কী আর হবে এতে। আর শোনো, এ নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা যেন না হয়। ফ্যাসাদ বাঁধতে পারে... সামোভার নিয়ে যাও আর বাতিটা নিবিয়ে দিয়ো...'

লিপা আর প্রাস্কোভিয়া চালার নিচে বসে বসে দেখল এক এক করে আলো নিভে গেল বাড়িটার। শুধু একেবারে ওপর তলায়, ভারভারার জানলায় দেবমূর্তির সামনে লাল নীল বাতিগুলো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওই বাতিগুলো থেকে শান্তি তৃপ্তি আর পবিত্রতা বিকীরিত হচ্ছে। তার মেয়েটির যে বিয়ে হয়েছে বড়োলোকের বাড়িতে এই ব্যাপারটা প্রাস্কোভিয়ার ধাতস্থ হয়নি এখনো। মেয়েকে দেখতে এলে সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতো জড়োসড়ো হয়ে, হাসত কৃতার্থের মতো। ওরা তার জন্যে চা আর চিনি পাঠিয়ে দিত বাইরে। লিপাও বিশেষ ধাতস্থ হতে পারেনি। স্বামী চলে যাবার পর থেকে সে আর নিজের বিছানায় শুত না, রান্নাঘর কি গোয়াল যেখানে হোক গা এলিয়ে দিত আর দৈনিক ধোয়া মোছার কাজ করে সময় কাটাত, মনে মনে ধরে নিয়েছিল এখনো বুঝি সে একজন ঠিকা ঝি-ই রয়ে গেছে। আজকেও তীর্থদর্শন করে ফিরে মা-মেয়েতে চা খেল রাঁধুনির সঙ্গে বসে, তারপর চালায় গিয়ে স্লেজগাড়ি আর দেয়ালের মাঝখানের জায়গাটুকুতে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। বাড়ির সবখানে আলো নিভে গেল। শোনা গেল কালা লোকটা দোকানে কুলুপ দিচ্ছে। উঠোনের ওপর ঘুমোবার আয়োজন করছে ক্ষেতমজুরগুলো। অনেক দূরে, খ্রিমিন ছোটো তরফদের বাড়িতে কে যেন সেই দামী হারমনিয়াম বাজাতে শুরু করেছে। প্রাস্কোভিয়া আর লিপা ঘুমোতে লাগল।

কার যেন পায়ের শব্দে ওরা যখন জেগে উঠল তখন আলো হয়ে গেছে,

কারণ চাঁদ উঠেছে। চালার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আকসিনিয়া। তার হাতে বিছানার টুকিটাকি।

ভেতরে এসে আকসিনিয়া বলল, 'এই খানটাতে তবু একটু ঠাণ্ডা হবে।' বলে প্রায় চৌকাঠের ওপরেই শুয়ে পড়ল। সারা শরীর তার আলো হয়ে উঠল জ্যোৎস্নায়।

আকসিনিয়া ঘুমোল না। গায়ের কাপড়জামা সবই প্রায় খুলে দিয়ে গরমে এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাঝে মাঝে। জ্যোৎস্নার যাদুতে তাকে দেখে মনে হল যেন কোন অপরূপ সুন্দরী গর্বিণী এক জন্তু। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ো কর্তা সাদা পোষাক গায়ে।

ডাকল, 'আকসিনিয়া! আছো নাকি এখানে?'

ব্যাজার হয়ে আকসিনিয়া বলল, 'কেন, কী দরকার?'

'বললাম যে টাকাগুলো কুয়োতে ফেলে দিতে। দিয়েছো?'

'অমন কড়কড়ে জিনিসগুলোকে জলে দেব আমাকে তেমন মুখ্যু পাননি! ওই দিয়ে ক্ষেতমজুরগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছি।'

'এই সেরেছে!' বুড়ো কর্তার কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা ফুটে উঠল,'বেয়াদব মাগীটাকে নিয়ে ... হায় ভগবান!'

হতাশার ভঙ্গিতে সে তার হাত দুটো জোড় করে চলে গেল নিজের মনে বকবক করতে করতে। খানিক বাদেই আকসিনিয়া উঠে বসে বিরক্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জোরে। তারপর বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

লিপা বলল, 'এ বাড়িতে কেন আমার বিয়ে দিলে মা?'

'সবাইকেই বিয়ে করতে হয়, বাছা! এ তো আমাদের ইচ্ছের ওপর নয়, সকলের ইচ্ছে।'

সান্ত্বনাহীন এক দুঃখের অনুভূতিতে ওরা নিজেদের ছেড়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু মনে হল, কেউ একজন আছেন, আকাশের অনেক উঁচুতে, গহন নীলের মধ্যে যেখানে তারা ওঠে সেখান থেকে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, উকলেয়েভো গাঁয়ের যেখানে যা কিছু ঘটছে সব তিনি দেখতে পান, সবকিছু তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন। এ জীবনে অন্যায়ের দিকটা বড়ো বটে, কিন্তু বড়ো

শান্ত সুন্দর এই রাত। ভগবানের রাজ্যে ন্যায় আছে, ন্যায় থাকবে, এই রাতের মতোই সে ন্যায় শান্ত সুন্দর, পৃথিবীর সবকিছু যেন সেই ন্যায়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে যেমন করে জ্যোৎস্না বিলীন হয়ে যায় রাত্রির সঙ্গে।

তারপর মনের শান্তি ফিরে পেয়ে মা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এ ওর গা ঘেঁসে শুয়ে।

৮

অনেক আগেই খবর এসে গিয়েছিল যে টাকা জাল করা এবং টাকা চালানোর জন্যে আনিসিম হাজতে গেছে। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে, পেরিয়ে গেছে বছরের আর্ধেক, দীর্ঘ শীতকাল কেটে গিয়ে শুরু হয়েছে বসন্ত। গাঁ আর সংসারের সকলের কাছে সংবাদটা সয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাড়িখানা অথবা দোকান ঘরটার সামনে দিয়ে রাতে কাউকে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যেত আনিসিম হাজতে রয়েছে। কেউ মারা গেলে যখন গীর্জার ঘণ্টা বাজানো হত, তখনো কেন জানি আবার মনে পড়ে যেত সবাইকার আনিসিম হাজতে রয়েছে, তার বিচার হবে।

গোটা বাড়িখানার ওপর যেন ছায়া নেমেছে একটা। মনে হত বুঝি বাড়ির দেয়ালগুলোও কেমন কালচে হয়ে গেছে, মরচে ধরেছে ছাতে, দোকান ঘরের লোহা বাঁধানো সবুজ রঙের ভারি কবাট হয়ে উঠেছে ফাটা ফাটা। বুড়ো ৎসিবুকিন নিজেও যেন কালচে হয়ে গেছে কেমন। চুল কাটা, দাড়ি ছাঁটার পাট সে অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। সারা গালে তার অপরিচ্ছন্ন দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। গাড়িখানায় আর তেমন ফূর্তি করে লাফিয়ে ওঠে না সে, ভিখিরি দেখে চ্যাঁচায় না: ‘ভগবান তোমাদের দেখবেন!’ সামর্থ্য ক্ষয়ে আসছিল বুড়োর, তার আশেপাশের সবকিছু থেকেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। লোকে আর তাকে তেমন ভয় করত না। ঠিক আগের মতোই মোটা ঘুস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিসের লোক এসে একদিন তার দোকান সম্পর্কে একটা এজাহারও লিখে নিল। বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রির অভিযোগে বুড়োর তিনবার তলব এসেছে শহরের আদালত থেকে, কিন্তু তিনবারই

বিচারের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়েছে, কেননা সাক্ষী পাওয়া যায়নি। বুড়ো কর্তা কাহিল হয়ে গেল একেবারে।

হাজতে ছেলেকে দেখতে যেত সে প্রায়ই। একটা উকিল ঠিক করল, কোথায় কোথায় সব দরখাস্ত পাঠাল, গীর্জার জন্যে একটা ধ্বজা কিনে দিল। যে হাজতে আনিসিম ছিল সেখানকার ওয়ার্ডেনের জন্যে সে একটা রূপোর চামচ আর একটা গ্লাস-দানি উপহার দিল — জিনিসটার তলায় এনামেল করা অক্ষরে লেখা:

'আত্মা আত্মজ্ঞান রাখে।'

ভারভারা বলে বেড়াতে শুরু করল, 'কারুর কাছে সাহায্য নেবো এমন কেউ নেই আমাদের, কেউ নেই। জমিদার বাবুদের কাউকে ধরে বড়ো কর্তাদের কাছে দরখাস্ত পাঠানো দরকার ... বিচারের আগে ওকে যদি জামীনও দিত তাও হত... ছেলেটা ওখানে পচে পচে মরবে, এই কি কথা!'

দুঃখ ভারভারাও পেয়েছিল, তবু শরীরটা তার আর একটু মোটা আর একটু চেকনাই হয়ে উঠেছিল। ঠিক আগের মতোই সে প্রদীপ জ্বালাতো দেবমূর্তির সামনে, সংসারের দিকে নজর রাখত, আর কেউ এলে জ্যাম আর আপেলের জেলি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন জানাতো। আকসিনিয়া আর তার কালা স্বামী আগের মতোই কাজ করত দোকানে। নতুন একটা কারবার খোলার তোড়জোড় চলছিল — বুতেকিনোতে একটা নতুন ইঁটখোলা, আকসিনিয়া সেখানে রোজই প্রায় দেখতে যেত গাড়ি চেপে। গাড়িটা চালাতো সে নিজেই, পথে চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে কচি রাইক্ষেত থেকে মাথা তোলা সাপের মতো সে মুখ বাড়িয়ে হাসত, সেই সরল রহস্যময় হাসি। আর সারাদিন লিপা খেলা করে বেড়াত তার বাচ্চাটাকে নিয়ে। লেন্ট পরবের ঠিক আগেই তার ছেলেটি হয়েছে, ছোট্ট, রোগা, রুগ্ন। ওটা যে কাঁদতে পারে, আশেপাশে তাকাতে পারে, লোকে যে ওটাকে মানুষ বলে গণ্য করতে পারে এ সব দেখে ভারি অবাক লাগত তার। ছেলেটার নাম দেওয়া হয়েছিল নিকিফর। দোলনায় শুইয়ে রেখে লিপা দরজা পর্যন্ত পেছিয়ে এসে অভিবাদন করে বলত, 'কেমন আছো নিকিফর আনিসিমিচ্, ভালো তো?'

তারপর হঠাৎ ছুটে এসে চুমু দিয়ে ভরে দিত ছেলেটাকে। তারপর আবার দরজা পর্যন্ত পেছিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বলত:

'কেমন আছো নিকিফর আনিসিমিচ্, ভালো?'

আর বাচ্চাটা তার ছোটো ছোটো লাল লাল পা ছুঁড়ে হাসত আর কাঁদত প্রায় একই সঙ্গে, ঠিক একেবারে ছুতোর মিস্ত্রি ইয়েলিজারভের মতো।

অবশেষে বিচারের তারিখ ধার্য হল একদিন। সে তারিখের পাঁচ দিন আগেই বুড়ো কর্তা সহরে রওনা দিল। শোনা গেল, সাক্ষী হিসেবে গাঁয়ের কিছু চাষীকেও ডাকা হয়েছে। ৎসিবুকিনের পুরনো মুনিষটাও সমন পেয়ে চলে গেল।

কথা ছিল বৃহস্পতিবার বিচার হবে। কিন্তু রবিবারও পেরিয়ে গেল, না ফিরল বুড়ো কর্তা, না পাওয়া গেল কোনো সংবাদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে ভারভারা তার জানলাটিতে বসে বসে ৎসিবুকিনের ফেরার অপেক্ষা করছিল। লিপা খেলছিল তার বাচ্চার সঙ্গে পাশের ঘরে। ছেলেটাকে নাচাতে নাচাতে সে সুর করে বলছিল:

'ছেলে আমার বড়ো হবে, কতো বড়ো হবে, মরদ হয়ে উঠবে। মায়ে পোয়ে আমরা তখন মজুরি করতে বেরুব! মায়ে পোয়ে কাজ করব আমরা!'

ভারভারা চমকে উঠল, 'ছিছি! মজুরি করতে যাওয়া, এসব আবার কী কথা! বড়ো হয়ে ও ব্যবসা করবে।'

ধমক খেয়ে লিপা আস্তে করে গান গাইতে শুরু করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার সব কিছু ভুলে শুরু করল, 'বড়ো হবে ছেলে, অনেক বড়ো হবে, মরদ হয়ে উঠবে, মায়ে পোয়ে একসঙ্গে কাজে বেরুব আমরা!'

'আবার শুরু করেছো তো?'

নিকিফরকে কোলে নিয়ে লিপা এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। বলল, 'বাচ্চাটাকে এত ভালোবাসি কেন মা, কেন যে এটাকে এত ভালো লাগে!' কথা বলতে গিয়ে ওর গলা ভেঙে আসে, চোখ দুটো চিক চিক করে উঠে জলে, 'কে ও? কী ওটা? পালকের মতো পলকা। ছিঁচকাদুনে এইটুকুন একটা জীব — অথচ মনে হয় সত্যিকারের একটা মানুষকেই বুঝি ভালোবাসছি। দ্যাখো দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, একটা কথাও তো মুখ দিয়ে বেরোয় না, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইলেই আমি টের পাই কী চাইছে।'

ভারভারা কান পাতে আবার। সন্ধ্যার ট্রেনটা স্টেশনে এসে পৌঁছচ্ছে। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুড়ো কর্তা হয়ত এতে আসবে। লিপা কী বলছে

তার কিছুই সে শুনছিল না, বুঝছিল না। সময়ের জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে সে বসে বসে কাঁপছিল, ভয়ে ততটা নয়, বরং তীব্র একটা ঔৎসুক্যে। চাষী ভর্তি একটা গাড়ি পার হয়ে গেল সশব্দে। যারা সাক্ষী দিতে গিয়েছিল তারা স্টেশন থেকে ফিরছে। দোকানের সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর এ বাড়ির পুরনো মুনিষটা লাফ দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। ভারভারা শুনতে পেল, উঠোনের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ...

লোকটা বেশ জোরে জোরে জবাব দিল, 'বিষয় সম্পত্তির অধিকার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ছয় বছরের জন্যে সাইবেরিয়া — সশ্রম কারাদণ্ড।'

দোকানের খিড়কি দরজা দিয়ে আকসিনিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কেরোসিন বেচছিল সে, তাই তার এক হাতে একটা বোতল, অন্য হাতে একটা ফানেল, আর দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে কয়েকটা রুপোর মুদ্রা।

'কিন্তু বাবা কোথায়?' অস্ফুট স্বরে সে বলল।

মুনিষটি বলল, 'স্টেশনে। বলে দিলেন, অন্ধকার হলে বাড়ি ঢুকবেন।'

আনিসিমের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, এখবরটা যখন বাড়ির ভেতর জানাজানি হয়ে গেল তখন রান্নাঘরের মধ্যে রাঁধুনী মরাকান্না জুড়ে দিল উচ্চ স্বরে। তার ধারণা এই রকম করাই শোভন।

'আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে বাছা আনিসিম গ্রিগরিচ, কোথায় গেলে আমার ঈগল সোনামণি?'

কুকুরগুলো সচকিত হয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। ভারভারা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে শোকে অস্থির হয়ে দুলতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আপ্রাণ চেঁচিয়ে রাঁধুনীকে সে ধমক দিল:

'থামো বাপু স্তেপানিদা, থামো। ভগবানের দোহাই, মরাকান্না কেঁদে আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়িয়ো না।'

সামোভারটা যে জ্বালাতে হবে সে কথা মনে পড়ল না কারুর। মনে হল সকলেরই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র শুধু লিপাই বুঝল না কী হয়েছে। ছেলেটিকে সে আদর করে গেল ঠিক একইভাবে।

স্টেশন থেকে বুড়ো কর্তা ফিরলে কেউ তাকে কিছু জিগ্যেস করল না। মামুলী কুশলের দু একটা কথা বলে বুড়ো নিঃশব্দে হেঁটে গেল ঘরগুলোর মধ্যে। রাত্রে খেলো না।

সবাই চলে গেলে ভারভারা বলল, 'সাহায্য করার মতো লোক আমাদের কেউ নেই তখন বলেছিলাম, জমিদার বাবুদের কাউকে ধরতে। আমার কথা শুনলে না একটা দরখাস্ত পাঠানো উচিত ছিল ...'

হাত নেড়ে বুড়ো কর্তা বলল, 'যা সামর্থ্য তাই করেছি। রায় পড়া হলে আমি আনিসিমের উকিলের কাছে গেলাম। সে বলল, এখন আর কিছু করা যায় না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আনিসিমও সেই কথাই বলল, "বড্ডো দেরি হয়ে গেছে।" তবুও, আদালত থেকে বেরুবার আগে আমি এক উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি। আগাম কিছু টাকাও দিয়ে এসেছি ওকে .. সপ্তাহ খানেক দেখে আবার যাবো। এখন ভগবান যা করেন।'

ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে আর এক দফা নিঃশব্দে পায়চারি করে বুড়ো কর্তা ফিরে এল ভারভারার কাছে। বলল:

'আমার বোধ হয় অসুখ করেছে। মাথাটা কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। স্পষ্ট করে কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

তারপর, লিপা যাতে শুনতে না পায় সেইজন্যে দরজা বন্ধ করে এসে বলল:

'আমার টাকাপয়সাগুলো নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি। সেই যে বিয়ের ঠিক আগে, ইস্টারের পরের হপ্তায় আনিসিম আমার জন্যে কতকগুলো নতুন নতুন রুবল আর আধুলি নিয়ে এসে দিয়েছিল না? তার একটা মোড়ক আমি রেখেছিলাম আলাদা করে। কিন্তু বাদবাকি সব আমি নিজের টাকাপয়সার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছি ...আমার খুড়ো দ্মিত্রি ফিলাতিচ্ (ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন!) যখন বেঁচে ছিল, তখন মাল কেনার জন্যে সে কখনো ক্রিমিয়া কখনো মস্কো করে বেড়াত। তার একটি স্ত্রী ছিল। খুড়ো যখন মাল কেনার জন্যে বাইরে থাকত, তখন সেই স্ত্রী ঘুরত অন্য লোকের সঙ্গে। ওদের ছিল ছটি ছেলে মেয়ে। আর আমার খুড়োর পেটে যখন দু এক ঢোক বেশি মদ পড়ত তখন সে হাসতে হাসতে বলত, 'ছেলেগুলোর কোনটা আমার, কোনটা আমার নয় কিছুতেই ঠাহর করতে পারি না হে।" ওমনি কাছাখোলা লোক ছিল সে। এখন আমারও হয়েছে সেই দশা—কোনগুলো যে ভালো টাকা কোনগুলো জাল, কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সবগুলোই বুঝি জাল।'

'ভগবানের দোহাই, অমন কথা বলো না!'

'সত্যি বলছি। স্টেশনে টিকিট করতে গিয়ে তিনটে রুবল বার করে দিয়েছি দাম হিসেবে। আর অমনি ভাবনা ধরে গেছে, জাল নয়ত? ভয়ানক ভয় করছে আমার। নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে একটা।'

ভারভারা মাথা নেড়ে বলল, 'যাই বলো, শেষ পর্যন্ত ভগবান যা করবেন তাই হবে। তাই পেত্রোভিচ্, আমাদের এখন থেকেই ভেবে রাখা উচিত ... খারাপ কিছু একটা ঘটে যেতে কতোক্ষণ, তুমি তো আর জোয়ান নও। তুমি না থাকলে, বলা তো যায় না, তোমার নাতির সঙ্গে যদি সকলে খারাপ ব্যবহার করে! নিকিফরের কথা ভেবে আমার ভাবনা হচ্ছে। বাপটা তো নেই বললেই হয়, আর মা-টির না হয়েছে বয়েস, না আছে জ্ঞানগম্যি... তুমি ওর জন্যে অন্তত বুতোকিনোর জমিটুকু দানপত্র করে যাও। এটা তোমার সত্যিই করা উচিত, পেত্রোভিচ্।' ভারভারা ভালো করে বোঝাতে শুরু করল, 'ভেবে দেখো ছোট্ট টুকটুকে ঐটুকু জীব। না করলে কী লজ্জার কথাই না হবে। কাল যাও, গিয়ে একটা দলিল করে এসো। অপেক্ষা করে কী লাভ?'

ৎসিবুকিন বলল, 'ঠিক বটে, ছেলেটার কথা আমার মনেই ছিল না ... আজ এসে আমি ওকে দেখিও নি। বেশ ভালো বাচ্চা, বলছ? আচ্ছা বেশ! তাহলে বড়ো হোক ছেলেটা, ভগবানের কৃপায় বে'চে বর্তে থাকুক।'

দরজা খুলে বুড়ো তর্জনীর ইশারায় লিপাকে ডাকল। ছেলে কোলে লিপা এসে দাঁড়ালো।

বুড়ো বলল, 'লিপা বৌমা, তোমার যখনই কিছু দরকার হবে বলো, কেমন? যা খেতে ভালো লাগবে খাবে। আমরা কিছুই মনে করব না। তুমি বেশ ভালোভাবে থাকো এইটুকুই শুধু আমরা চাই।'... বাচ্চাটার শরীরের ওপর বুড়ো একটা ক্রুসের চিহ্ন আঁকল, 'আর আমার নাতিটিকে দেখো। আমার ছেলেটিকে আমি খোয়ালাম, কিন্তু নাতিটি তো আছে।'

গাল বেয়ে জলের ধারা পড়ছিল ওর। ফুঁপিয়ে উঠে বুড়ো চলে গেল নিজের ঘরে। তারপর, সাতটি বিনিদ্র রজনীর পর আজ শয্যা নেবার পর ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

॥

মাঝখানে বেশ কয়েক দিনের জন্যে বুড়ো কর্তা শহরে গিয়েছিল। আর্কাসিনিয়া কার কাছ থেকে যেন একদিন শুনল কর্তা শহরে গিয়েছিল উকিল ধরে একটা উইল করবার জন্যে। আর যেখানে সে ইঁটখোলা বানিয়েছে সেই বুতোকিনো জায়গাটাই সে উইল করে দিয়েছে তার নাতি নিকিফরের নামে। ঘটনাটা সে শুনল এক সকালবেলায়, ভারভারা আর বুড়ো কর্তা তখন বারান্দার সামনে বার্চ গাছটার তলায় বসে চা খাচ্ছে। দোকানের সদর খিড়কির দুটো দরজাতেই কুলুপ দিয়ে আর্কাসিনিয়া তার সমস্ত চাবির গোছা নিয়ে এসে বুড়ো কর্তার পায়ের কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আমি আর আপনার জন্যে খেটে মরতে পারব না!' আর্কাসিনিয়া তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'আমি তো আপনার বাড়ির বৌ নই, চাকরাণী। লোকে হেসে হেসে বলছে, 'দেখো, ৎসিবুকিনেরা কী সুন্দর একটা চাকরাণী পেয়েছে।' আপনার বাড়িতে মুনিষ খাটব বলে আমি আসিনি! ভিখিরি পাননি আমাকে— আমার মা আছে, বাপ আছে।'

চোখের জল না মুছেই সে তার রাগে জ্বলন্ত জলভরা দুই চোখে বুড়ো কর্তার মুখের দিকে চেয়ে আপ্রাণ জোরে চেঁচাতে শুরু করল; চেঁচানির ফলে মুখ আর ঘাড় লাল হয়ে উঠল তার:

'আপনার সেবা করা এই আমার শেষ! খাটতে খাটতে হাড় কালি হয়ে গেছি! কাজের বেলা তখন আমি, দিনের পর দিন দোকানে বসে থাকো রে, রাতের আঁধারে ভদকা বেচো রে! আর জমি দানপত্তর করার বেলায় ওরা, ঐ কয়েদীটার বৌ আর তার পুঁচকে বেটা! এ বাড়িতে উনিই তো রাজরাণী আর আমি হলাম চাকরাণী! বেশ, তাই করুন, ওকেই দিন সবকিছু, ওই জেলের কয়েদীটাকে। খেয়ে খেয়ে গলায় আটকে ওরা মরুক, আমি নিজের বাড়ি চললাম। শয়তান কোথাকার! বোকাসোকা আর একটা কাউকে পারলে ধরে নিয়ে আসুন গে!'

বুড়ো কর্তা জীবনে কখনো তার ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেয়নি, গালাগালি করেনি। ভাবতেও পারেনি কখনো তারই সংসারের কেউ কোনোদিন তার মুখের ওপর মুখঝামটা দেবে, তাকে অসম্মান করবে। এ ঘটনায় সে এমন ভয়

পেল যে ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল একটা দেরাজের পেছনে। আর বিমূঢ় হয়ে গেল ভারভারা। ওঠবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে শুধু হাতটা এমন ভাবে নাড়তে লাগল যেন কোনো একটা মাছি তাড়াতে চাইছে।

আতঙ্কে সে বিড়বিড় করে কেবল বলতে লাগল, 'এ সব কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এসব? অমনি করে চিৎকার করে নাকি কেউ? লোকে শুনতে পাচ্ছে যে! একটু আস্তে বললে কী হয়... একটু আস্তে!'

আকসিনিয়া চেঁচিয়েই গেল: 'ওই কয়েদীর বৌটাকে আপনি বুতেকিনো লিখে দিয়েছেন! দিন না, দিন, সবকিছু ওকেই দিন! আপনার কাছ থেকে এক পয়সাও আমার দরকার নেই! আপনারা গুষ্টিশুদ্ধ মরুন! চোরের ঝাড় সবাই! ঢের দেখেছি আমি, দেখে দেখে চোখ পচে গেল! রাস্তার লোক, পথিকদের গলা কাটেন আপনারা, বদমাইস কোথাকার, ছেলে হোক বুড়ো হোক, কাউকে ছাড়েন না! বিনা লাইসেন্সে বেআইনী ভদকা বেচে কে? জাল টাকা কে চালাচ্ছে? জাল টাকায় সিন্দুক তো ভর্তি করে ফেলেছেন—এখন আর আমাকে কী দরকার!'

হাট করে খোলা ফটকটার সামনে ইতিমধ্যে একটি ভিড় জমে উঠেছে। অন্দরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

আকসিনিয়া চিৎকার করে বলল, 'দেখুক সবাই! রাজ্যের লোকের সামনে হাটে হাঁড়ি ভাঙব! অপমানে জ্বলে পুড়ে মরবে! আমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে! এই, স্তেপান!' কালা লোকটাকে আকসিনিয়া ডাক দিল, 'এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। বাপের বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে! চোর জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি আর থাকছি না। যা আছে বাঁধাছাঁদা করে নাও।'

দড়িতে মেলে-দেওয়া কাপড় শুকোচ্ছিল উঠোনের ওপর। সেখান থেকে আকসিনিয়া তার ভিজে বডিস্ আর পেটিকোট টান মেরে খসিয়ে এনে গুঁজে দিল কালার হাতের মধ্যে। তারপর ক্ষেপার মতো দাপাদাপি করে বেড়াল সারা আঙিনা। যা পেলে সবকিছু টেনে টেনে আনল, আর যে জিনিসগুলো ওর নিজের নয় সেগুলোকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গেল।

ভারভারা বিলাপ করে উঠল, 'মা গো মা, ওকে থামাও কেউ তোমরা! একী হল ওর, যীশুর দোহাই, বুতেকিনোটা ওকেই দিয়ে দাও বাপু!'

ফটকের সামনে লোকগুলো বলাবলি করল, 'কী মাগী রে বাবা! এমন মেজাজ আর কখনো দেখিনি।'

আকসিনিয়া দাপিয়ে এসে ঢুকল রান্নাঘরে। রান্নাঘরে কাপড় সিদ্ধ করা হচ্ছিল। রাঁধুনী কাপড় ধুতে চলে গিয়েছিল নদীতে। ভেতরে একলা বসে বসে ধোয়াধুয়ি করছিল লিপা। উনুনের সামনে একটা ভাঁটি আর একটা কাপড় ধোয়া গামলা থেকে ধোঁয়া উঠে ঘরখানাকে ঝাপসা আর গুমোট করে তুলেছে। মেঝের ওপর একগাদা আ-কাচা কাপড় স্তূপ হয়ে আছে। আর তার পাশেই একটা বেঞ্চির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে নিকিফরকে, যাতে ওখান থেকে পড়ে গেলেও না লাগে। রোগা রোগা লাল লাল পা ছুঁড়ে খেলা করছে নিকিফর। আকসিনিয়া যখন রান্নাঘরে ঢুকল তখন লিপা কাপড়ের স্তূপ থেকে তার একটা শেমিজ টেনে এনে গামলার মধ্যে গুঁজল, তারপর টেবিলের ওপর যে ফুটন্ত জল রাখা হয়েছিল সেইটের দিকে হাত বাড়াল…

গামলা থেকে আকসিনিয়া তার শেমিজটা ছিনিয়ে নিয়ে তীব্র ঘৃণায় তাকাল লিপার দিকে, 'ওটা ছেড়ে দাও! আমার কাপড় তোমাদের ছুঁতে হবে না। কয়েদীর বৌ তুমি—কার কি শোভা পায় সেটা জেনে রেখে দিয়ো।' স্তম্ভিত লিপা হাঁ করে চেয়ে রইল ওর দিকে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। হঠাৎ তার নজরে পড়ল আকসিনিয়া কী রকম করে যেন চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে। হঠাৎ জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লিপা।

'আমার জমি চুরি করার ফল ভোগো এবার।' এই কথা বলে আকসিনিয়া গামলাভর্তি ফুটন্ত জল ঢেলে দিল নিকিফরের ওপর।

একটা চিৎকার শোনা গেল শুধু—উকলেয়েভো গ্রামে এরকম চিৎকার আর কখনো কেউ শোনেনি। লিপার মতো অমন নরম পলকা একটা শরীর থেকে অমন চিৎকার উঠতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না। আর তারপর সারা আঙিনা জুড়ে নেমে এল একটা নিথর স্তব্ধতা। নিঃশব্দে আকসিনিয়া ঘরের ভেতর চলে গেল। মুখে তার সেই অদ্ভুত নিরীহ একটা হাসি… ভেজা জামাকাপড় হাতে নিয়ে কালা লোকটাও এতক্ষণ পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এবার সেগুলোকে সে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে মেলে দিতে শুরু করল আবার। আর নদীর ঘাট থেকে রাঁধুনীটা না ফেরা পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢুকে কী হচ্ছে দেখার সাহস হল না কারুর।

৮

নিকিফরকে নিয়ে যাওয়া হল জেমস্তভো হাসপাতালে। সন্ধ্যার দিকে সে মারা গেল। বাড়ির গাড়ির জন্য লিপা অপেক্ষা করেনি। সে তার মরা ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গেল।

হাসপাতালটা পাহাড়ের ওপরে। নতুন তৈরি, জানলাগুলো বেশ বড়ো বড়ো। ঢলে পড়া সূর্যের রোদে জ্বলছিল, যেন আগুন লেগেছে। নিচে এলিয়ে আছে গ্রামখানা। রাস্তা দিয়ে নেমে লিপা গাঁয়ে ঢোকার ঠিক আগে একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসে রইল। একটা ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ঘোড়াটা জল খেতে চাইছিল না।

মেয়েটা যেন অবাক হয়ে বলল, 'জল খেলি না কেন? কী হল?'

জলের ঠিক ধারে লাল সার্ট পরা একটা ছেলে তার বাপের বুটজুতো পরিষ্কার করছিল উবু হয়ে বসে। এ ছাড়া আর একটি লোকও চোখে পড়ে না, না গাঁয়ের মধ্যে, না পাহাড়ের গায়ে।

ঘোড়াটার দিকে নজর করে লিপা বলল, 'ও খাবে না...'

মেয়েটা আর বুট হাতে-করা ছেলেটা দুজনেই চলে যাবার পর আর একটা লোককেও দেখা গেল না কোথাও। সিঁদুরে সোনালীতে গাঁথা এক উদার শয্যায় সূর্য গা এলিয়েছে। লাল আর বেগুনী রঙের লম্বা লম্বা মেঘের সারি আকাশ জুড়ে তাকিয়ে আছে তার ঘুমের দিকে। অনেক দূরে, কোথা থেকে কে জানে, একটা বক ডাকছিল। মনে হচ্ছিল যেন গোয়ালে বাঁধা কোনো গরুর ভাঙা ভাঙা বিষন্ন হাম্বারব। প্রতি বছর বসন্তে এই অদ্ভুত পাখিটার ডাক শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ জানে না, পাখিটা দেখতে কেমন, কোথায় বাসা। পাহাড়ের মাথায়, হাসপাতালের পাশে, পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে আর সারা মাঠ জুড়ে নাইটিঙ্গেল পাখির গান শোনা যাচ্ছে। কোকিলগুলো যেন কারো বয়স গুনতে বসে বার বার ভুল করে বসছে তারপর আবার শুরু করছে প্রথম থেকে গুনতে। রূঢ় রুক্ষ গলায় পরস্পরকে ডাকাডাকি শুরু করেছে পুকুরের ব্যাঙগুলো — যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কথা:

'ঈ তি তাকভা, ঈ তি তাকভা।'* চারিদিকে শব্দের রাজ্য। মনে হয় বুঝি

---

* তুইও সমান পাজী।

ওরা সবাই যেন গান আর চীৎকার শুরু করেছে ইচ্ছে করে, যাতে এই বসন্তের রাত্রে কেউ না ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে সকলেই এমনকি বদরাগী ব্যাঙগুলোও এ রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে উপভোগ করে নিতে পারে: কেননা জীবন তো আমাদের এই একটাই!

তারাভরা আকাশে চাঁদ উঠল বাঁকা, রুপালী। কতোক্ষণ পুকুরের পাড়ে বসেছিল সে, খেয়াল ছিল না লিপার। উঠে যখন সে হাঁটতে শুরু করল তখন দেখা গেল গাঁয়ের সকলেই শুয়ে পড়েছে, আলোগুলো নিভে গেছে। এ গাঁ থেকে উকলেয়েভো সম্ভবত বারো ভের্স্ত দূরে; বড়ো কাহিল লাগছিল লিপার, পথ খুঁজে বার করার ইচ্ছেটুকুও তার আর ছিল না। চাঁদটা কখনো তার সামনে পড়ছে, কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে, আর কোকিলটা যেন ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলেছে। আর ভাঙা গলাতেই হেসে হেসে টিটকিরি দিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে: 'পথ ভুলো, পথ ভুলো!' লিপা জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করল। মাথার ওড়নাটা তার হারিয়ে গেল কখন ... আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবছিল, তার ছেলের আত্মা এখন না জানি কোথায়। সে কী তার মায়ের পিছু পিছুই আসছে? নাকি তার মাকে ভুলে গিয়ে অনেক উঁচুতে ভেসে গেছে তারাগুলোর কাছে? কী নিঃসঙ্গ এই রাতের মাঠ, যখন চারিদিকের এই সঙ্গীতের মাঝখানে তোমার উপায় নেই গাইবার, যখন এই অবিরত হর্ষধ্বনির মাঝখানে তোমার আনন্দ নেই, যখন আকাশ থেকে তোমার মতোই নিঃশব্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চাঁদ, বসন্তই হোক আর শীতই হোক, লোকে বেঁচেই থাক কি মরেই যাক, কিছুতেই যার কিছু যায় আসে না... মন যখন দুঃখে ভরে ওঠে তখন একলা থাকা বড়ো কষ্টের। শুধু যদি একবার তার মাকে, কি 'পেরেক'কে কি রাঁধুনীকে কি যা হোক কাউকে এখন কাছে পেত লিপা।

'বু-উ-উ!' বক ডাকল, 'বু-উ-উ!'

হঠাৎ পরিষ্কার শোনা গেল একটি মানুষের কণ্ঠস্বর:

'চলে আয়, ভাভিলা, ঘোড়াটাকে জোত।'

খানিকটা দূরে, রাস্তার ঠিক পাশেই আগুন জ্বালানো হয়েছিল। শিখাগুলো নিভে এসেছে এখন শুধু অঙ্গারগুলো জ্বলছে। ঘোড়ার দানা চিবুনোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে ঠাহর করা গেল দুটো গাড়ি, একটার ওপর ব্যারেল চাপানো; অন্যটা নিচু, বস্তায় ভর্তি। দুটো লোককেও ঠাহর

করা গেল, তাদের একজন গাড়ির কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগুনটার সামনে, হাত দুটো তার পেছন দিকে ধরা। গাড়িগুলোর কাছে কোথা থেকে একটা কুকুর গোঁ গোঁ করে উঠল। যে লোকটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল সে থেমে বলল:

'রাস্তা দিয়ে কেউ বোধ হয় আসছে।'

অন্য লোকটা কুকুরকে ধমক দিল, 'চুপ চুপ করো, শারিক!'

গলা শুনে বোঝা যায় লোকটা বুড়ো। লিপা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

বুড়ো লোকটা লিপার কাছে এগিয়ে গেল কিন্তু প্রথমটা কিছু বলল না। পরে শুধু বলল:

'শুভ সন্ধ্যা!'

'তোমার কুকুরটা কামড়াবে না তো, দাদু?'

'না, না, পেরিয়ে যাও, কিছু বলবে না।'

একটু থেমে লিপা বলল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার কচি ছেলেটা মারা গেল। ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

লিপার কথায় বেশ বোঝা গেল বুড়ো লোকটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। লিপার কাছ থেকে সরে সে তাড়াতাড়ি বলল:

'ভেবে কী হবে বাছা, ভগবানের ইচ্ছা।' তারপর তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'কী হল হে! জলদি করো না কেন?'

ছোঁড়াটা জবাব দিল, 'তোমার জোয়ালটা কোথায়,পাচ্ছি না বাপু।'

'কোনো কম্মের নোস তুই, ভাভিলা!'

একটা পোড়া কাঠকয়লা তুলে নিয়ে বুড়োটা ফুঁ দিতে লাগল। তাতে ওর চোখ আর নাকের ওপরটা আলো হয়ে উঠল খানিকটা। জোয়ালটা খুঁজে পাওয়া যাবার পর বুড়ো লিপার কাছে সরে এসে তাকিয়ে দেখল। কাঠকয়লাটা তখনো তার হাতে ধরা। বুড়োর চাউনিতে অনুকম্পা আর কোমলতা মেশা।

বলল, 'তুমি মা হয়েছো। সব মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালো বুড়ো। আগুনের মধ্যে কী একটা ঢেলে ভাভিলা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে ফেলল আগুনটা। সঙ্গে সঙ্গে

চারিদিক ভরে উঠল নিবিড় অন্ধকারে। চোখে আর কিছুই দেখার উপায় রইল না, শুধু আবার ফিরে এল সেই মাঠ, সেই তারাভরা আকাশ, সেই মুখর পাখিপাখালি যারা পরস্পর পরস্পরকে জাগিয়ে রেখেছে। আর যেখানটায় আগুন জ্বালানো হয়েছিল মনে হল যেন ঠিক সেইখানটাতেই এসে কাঁদতে শুরু করেছে একটা স্যাণ্ড্রেল।

মিনিট দুয়েক পরে অবশ্য গাড়ি দুটো, বুড়ো আর ঢ্যাঙ্গা ভাভিলাকে দেখতে পাওয়া গেল আবার। গাড়ি দুটোকে টেনে রাস্তায় আনার সময় চাকাগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

লিপা জিগ্যেস করল, 'তোমরা কি সাধু সন্ন্যাসী কিছু বটে?'

'না বাছা। আমরা থাকি ফিরসানভোতে।'

'তুমি তখন আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলে যে আমার বুকটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আর তোমার সঙ্গের ঐ ছেলেটিও ভারি শান্ত। তাই মনে হয়েছিল, হয়ত সাধু সন্ন্যাসী কেউ হবে বা।'

'তোমাকে কি অনেক দূর যেতে হবে?'

'যাবো উবক্লেয়েভোতে।'

'উঠে বসো তাহলে। কুজ্‌মিনকি পর্যন্ত তোমায় পেঁছে দিতে পারি। সেখান থেকে আমরা বাঁয়ে বেঁকব। তুমি চলে যাবে সোজা।'

যে গাড়িটায় ব্যারেল চাপানো ছিল তাতে উঠল ভাভিলা। আর অন্য গাড়িটায় বুড়ো আর লিপা। গাড়ি চলল আস্তে আস্তে, ভাভিলার গাড়িখানা আগে আগে।

লিপা বলল, 'সারাদিন ছেলেটা যন্ত্রণা পেয়েছে। ওর সেই সুন্দর সুন্দর চোখ দিয়ে সে আমার দিকে এমন করুণ করে চাইছিল। মনে হচ্ছিল কী যেন বলতে চাইছে, পারছে না। হায় ভগবান, হায় মা দেব-জননী, শোকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কখন টলে পড়ে গেছি। কেন বলো না, মরার আগে ওইটুকু একটা ছেলেকে অত কষ্ট কেন সইতে হয়। যারা বড়ো, মেয়ে হোক মরদ হোক, বড়োরা যখন কষ্ট পায় তখন তাদের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো পাপ ও করেনি, ওইটুকুন একটা বাচ্চাকেও কেন অতো কষ্ট সইতে হয়, কেন?'

বুড়ো লোকটা বলল, 'কে জানে বাছা?'

আধঘণ্টাখানেক ধরে ওদের গাড়িটা চলল নিঃশব্দে।

বুড়ো বলল, 'কেন, কী জন্যে এর সব তো আর কেউ জানতে পারে না। পাখির পাখা দুটো মাত্র, চারটে নয়, কেননা দুটো পাখাতেই ওরা উড়তে পারে। তেমনি যতো কিছু জানা উচিত ভগবান মানুষকে তা সব জানতে দেননি, তার অর্ধেক কি সিকি ভাগই শুধু সে জানতে পারে। জীবন কেটে যাবার জন্য যেটুকু জানা দরকার সে সেইটুকু জানে।'

'হাঁটলে বোধ হয় একটু ভালো লাগত আমার। ঝাঁকুনিতে বুকটা কেমন করছে।'

'ও কিছু না, বসে থাকো চুপ করে।'

বুড়ো হাই তুলল, মুখের ওপর ক্রুসের চিহ্ন আঁকল।

আবার বলল, 'কিছু ভেবো না মা। তোমার শোক তো কেবল অল্প শোক। জীবন অনেক বড়ো, আরো কতো ভালোমন্দ ঘটবে জীবনে।' তারপর রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'হায় গো মা রাশিয়া! রাশিয়ার সব জায়গায় আমি গেছি, দেখার যা আছে সব আমি দেখেছি, আমাকে বিশ্বাস করো, বাছা। সুখও আছে দুঃখও আছে। সারা পথ আমি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সাইবেরিয়াতে। আমুর নদী দেখে এসেছি, দেখেছি আলতাই পাহাড়। সাইবেরিয়াতে বাসা বেঁধে জমি চাষ শুরু করেছিলাম। তারপর রাশিয়া মায়ের জন্যে মন কেঁদে উঠল। নিজের গাঁয়ে আবার ফিরে এলাম। পায়ে হেঁটে ফিরছিলাম—ফেরি নৌকোয় করে একটা নদী পার হচ্ছিলাম আমরা, বেশ মনে আছে। আমার চেহারা হয়েছিল কাঠির মতো সরু, ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, রুটির টুকরো পেলে তাই চুষে চুষে খিদে মেটাচ্ছি। ফেরি নৌকোতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন—কে জানে বেঁচে আছেন কিনা। না থাকলে ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন! তা সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়েছিলেন, দয়ায় তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে শুরু করল। বললেন, "তোমার রুটিটাও কালো, জীবনটাও কালো..." তারপর ফিরে এলাম যখন, না ছিল একটা ঘর না একটা দোর। এক বৌ ছিল, তা সাইবেরিয়াতে তাকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এসেছি গায়ে। তাই দিনমুনিষী করতে শুরু করলাম। তারপর জানো বাছা, দুঃখও ছিল, সুখও ছিল। এখন বাছা, আমি মরতে চাই না, আরো কুড়ি বছর পারলে বাঁচি। তাই

বলছি, দুঃখের চেয়ে সুখই বেশি। আহ্ দ্যাখো, দ্যাখো, কী মস্ত আমাদের রাশিয়া মা!' এপাশে ওপাশে আর পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটা আবার বলল কথাটা।

লিপা শুধালো, 'আচ্ছা, মারা যাবার পর আত্মাটা কতো দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে, জানো দাদু?'

'কে জানে বাপু। আচ্ছা রোসো, ভাভিলাকে জিগ্যেস করি। ও ইস্কুলে পড়েছে — ইস্কুলে আজকাল সবকিছু শিখিয়ে দেয়। ভাভিলা!'

'এ্যাঁ?'

'আচ্ছা ভাভিলা, কেউ মারা গেলে তার আত্মা কতো দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে?'

ভাভিলা ঘোড়াটাকে আগে দাঁড় করালো। তারপর জবাব দিল, 'ন' দিন। কিন্তু আমার খুড়ো কিরিলা মারা যাবার পর তার আত্মাটা আমাদের কুঁড়েতে তেরদিন অবধি ছিল।'

'কে বললে?'

'হ্যাঁ। তের দিন ধরে উনুনের মধ্যে খসখস শব্দ হত।'

বুড়ো বলল, 'খুব হয়েছে, গাড়ি হাঁকাও,' বোঝা গেল ওর একটি কথাও সে বিশ্বাস করেনি।

কুজ্‌মিনকির কাছে এসে গাড়িগুলো বড়ো রাস্তা ধরল। লিপা হেঁটে যেতে লাগল। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছিল। ঢালুতে যখন সে নামছিল তখন উকলেয়েভোর গীর্জা আর ঘরবাড়িগুলো সব কুয়াসায় ঢাকা পড়ে আছে। শীত করছে বেশ। লিপার মনে হল যেন সেই কোকিলটাই এখনো ডেকে চলেছে।

লিপা যখন বাড়ি পেঁছিল তখনও গরু চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সকলে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় বসে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সবার আগে বাইরে বেরিয়ে এল বুড়ো কর্তা। লিপার ওপর চোখ পড়তেই তার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থ হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

অবশেষে সে বলল, 'আঃ লিপা, আমার নাতিটিকে তুমি রাখতে পারলে না ...'

ভারভারাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। হাত ছুঁড়ে সে কাঁদল, তারপর কফিনের জন্য মরা ছেলেটিকে সাজাতে বসল।

ভারভারা বলে যেতে লাগল, 'কী সুন্দর ছিল ছেলেটা... তোর এই একটিই ছেলে বোকা মেয়ে, তাও রাখতে পারলি না!'

সকাল আর সন্ধ্যেয় অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকর্ম হল দু বার করে। কবর দেওয়া হল পরের দিন। কবর দেওয়ার পর পাদ্রী আর নিমন্ত্রিতেরা এমন হ্যাংলার মতো ভোজ্যবস্তু সৎকার শুরু করল যে মনে হল যেন কতো দিন ধরে ওদের খাওয়া জোটেনি। লিপা পরিবেশন করছিল টেবিলে। একটা ব্যাঙের ছাতার আচার কাঁটায় তুলে নিয়ে পাদ্রী তাকে বলল:

'বাচ্চাটার জন্যে দুঃখ করো না মা। ওপারে যে স্বর্গরাজ্য আছে সেখানে শুধু ওরাই তো যাবে।'

সকলে চলে যাবার পরে এতক্ষণে লিপা সত্যি সত্যি টের পেল নিকিফর নেই, নিকিফর আর ফিরবে না। আর টের পেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কোন ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে তা জানা ছিল না তার। সে বেশ অনুভব করছিল তার ছেলেটি মারা যাবার পর এ বাড়িতে তার আর কোনো জায়গা নেই, এখানে আশা করার কিছু নেই তার, সে অবাঞ্ছিত। আর সকলে যেন সে কথা টের পেয়ে গেছে।

দোরগোড়ায় হঠাৎ এসে হাজির হল আকসিনিয়া, অন্ত্যেষ্টির উপলক্ষ্যে সে আগাগোড়া নতুন পোষাক পরেছে, পাউডার লাগিয়েছে মুখে। সে চিৎকার করে বলল, 'বা বেশ, এখানে এসে মরাকান্না জুড়েছো দেখছি। চুপ করো!'

কান্না থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল হুহু করে আরো কে'দে উঠল লিপা।

রাগে পা ঠুকে আকসিনিয়া চে'চাল, 'কানে ঢুকছে না? এখান থেকে সরে পড়ো, এবাড়িতে আর মুখ দেখাতে এসো না, কয়েদীর বউ! যাও, বেরোও!'

বুড়ো কর্তা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'আঃ, ছেড়ে দাও আকসিনিয়া, একটু চুপ করো, বাছা... একটু কাঁদবেই তো... কোলের ছেলে মারা গেল...'

'কাঁদবে! কাঁদবেই তো!' ব্যঙ্গ করে উঠল আকসিনিয়া, 'আজ রাত্রিটা থাক, কিন্তু কাল সকালে ওকে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ভাগতে হবে। কাঁদবে!' মুখে হাসি নিয়ে আকসিনিয়া পা বাড়াল দোকানের দিকে।

পরদিন ভোরে লিপা চলে গেল তরগুয়েভোতে, তার মায়ের কাছে।

৯

দোকানের লোহার কবাট আর চালায় আবার টাটকা রঙ পড়ে নতুনের মতো চকচক করে আজকাল, বাড়ির জানলায় সুন্দর জেরানিয়াম ফোটে ঠিক আগের মতোই। ৎসিবুকিনদের সংসারে তিন বছর আগে কী ঘটেছিল তা এখন প্রায় ভুলে গেছে সবাই।

বুড়ো মানুষ গ্রিগরি পেত্রোভিচ্‌কেই এখনো বাড়ির কর্তা বলে ধরা হয়, কিন্তু আসলে সব কিছু চলে গেছে আকসিনিয়ার হাতে। কেনা বেচা যা করার সেই করে, তার মত ছাড়া কিছুই হয় না। ইঁটখোলার কারবারটা ভালোই চলছে, রেলওয়ের জন্যে ইঁটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম চড়ে গেছে চব্বিশ রুবলে হাজার। গাঁয়ের মেয়ে বৌয়েরা ইঁট বয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশনে মালগাড়ি ভর্তি করে দেয় আর মজুরি পায় পঁচিশ কোপেক রোজ।

খ্রিমনদের সঙ্গে অংশীদারিতে ঢুকেছে আকসিনিয়া। কারখানাটার নাম হয়েছে এখন 'খ্রিমন জুনিয়ার এন্ড কোং'। স্টেশনের কাছেই খুলেছে একটা সরাইখানা—সেই দামী হারমনিয়ামের বাজনাটা এখন আর কারখানায় শোনা যায় না, শোনা যায় সরাইখানাটাতে। সরাইখানাটায় যাতায়াত করে স্টেশন মাস্টার আর পোস্ট মাস্টার। পোস্ট মাস্টার নিজেও একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। খ্রিমন ছোটো তরফেরা একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছে কালা স্তেপানকে। ঘড়িটা সে অনবরত পকেট থেকে বার করে কানের কাছে এনে ধরে।

গাঁয়ের লোকে বলে আকসিনিয়ার ক্ষমতা খুব বেড়ে গিয়েছে। কথাটা সত্যিই হবে। কেননা সকালে যখন সে গাড়ি হাঁকিয়ে কারখানায় যায় আর সুখ উপচে পড়া সুন্দর চেহারায় তার সেই নিরীহ হাসি মুখে সারাদিন ধরে যখন সে চারপাশের লোককে হুকুম করে বেড়ায় তখন তার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। বাড়ির লোকই বলো, কি গাঁয়ের লোক কি কারখানার লোক, তাকে ভয় করে সবাই। আর যখন সে পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয়, পোস্ট মাস্টার লাফিয়ে উঠে বলে:

'বসুন বসুন, ক্সেনিয়া আব্রামভনা, বসুন।'

একদিন এক বয়স্ক জমিদার তাকে একটা ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছিল।

লোকটা ভয়ানক বাবু, গায়ে চমৎকার কাপড়ের একটা কোট, পায়ে পেটেন্ট লেদারের টপ বুট। আকসিনিয়ার কথাবার্তায় লোকটা এমন মোহিত হয়ে গেল যে আকসিনিয়া যে দরে চাইলে সেই দরেই ঘোড়াটা ছেড়ে দিল। আকসিনিয়ার হাতখানা সে অনেকক্ষণ ধরে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে তার উজ্জ্বল, নিরীহ, চালাক চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বলল:

'আপনার মতো একটি মেয়ের জন্য আমি সবকিছু করতে পারি, ক্সেনিয়া আব্রামভনা। কবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, কেউ যখন আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না?'

'যখন আপনার খুশি!'

তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেকদিনই দেখা যেত বয়স্ক বাবুটি গাড়ি হাঁকিয়ে দোকানে আসছে বিয়ার খেতে। বিয়ারটা জঘন্য, তিতকুটে। জমিদার বাবু কিন্তু তাই খেয়ে নিত মাথা ঝাঁকিয়ে।

ব্যবসার ব্যাপারে ৎসিবুকিন বুড়ো আর কোনো হস্তক্ষেপ করত না। নিজের পকেটে সে কোনো টাকাপয়সা রাখত না আর। কোনটা খাঁটি কোনটা জাল তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারত না সে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো কথা সে কাউকে বলেনি, তার এই অক্ষমতাটা কেউ জানুক, তা ও চাইত না। ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে, সামনে খাবার ধরে না দেওয়া পর্যন্ত খাবারের কথাও মনে থাকে না তার। ওকে ছেড়েই খেতে বসার চল হয়ে গেছে বাড়িতে। কেবল ভারভারা মাঝে মাঝে বলে:

'না খেয়েই ও আবার শুয়ে পড়েছে।'

বলে অবশ্য নিতান্ত নিরুদ্বেগে, কেননা ঐ ব্যাপারটা অভ্যেস হয়ে গেছে তার। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই বুড়ো তার ফার কোটখানি গায়ে দিয়ে বাইরে ঘোরে, কেবল অত্যন্ত গরম পড়লে বাড়িতে থাকে। গাঁয়ের রাস্তাতেই সাধারণত হাঁটা চলা করতে দেখা যায় তাকে। শীতের কোটটির কলার তুলে দিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে, নয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে আছে গীর্জার ফটকের সামনে একটি বেঞ্চিতে। বসে থাকে একেবারে নিথর হয়ে। রাস্তা দিয়ে যারা যায় তারা নমস্কার জানায়, কিন্তু নমস্কার সে ফিরিয়ে দেয় না কখনো, চাষাদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণাটা তার এখনো বজায় আছে। কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তর যে অমায়িক আর যুক্তিসঙ্গত হয় না তা নয়, কিন্তু ভারি সংক্ষিপ্ত।

গাঁয়ের লোকে বলে ওর ব্যাটার বৌ তাকে তার নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দিয়েছে, খেতে দেয় না। বুড়ো যেন ভিক্ষে করে চালায়। এ গুজব শুনে কেউ কেউ খুশি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে লোকটার ভাগ্য দেখে।

ভারভারা আরো মোটা হয়েছে, গায়ের রঙ হয়েছে আরো ফর্সা। এখনও সে দানধর্ম করে বেড়ায়, আকসিনিয়া বাধা দেয় না। প্রতি বছর গ্রীষ্মে সে এত বেশি করে জ্যাম বানায় যে পরের বছর বেরিফল পেকে গেলেও তা খেয়ে ফুরানো যায় না। ফলে জ্যামগুলো শক্ত হয়ে যায় আর ভারভারার চোখে প্রায় জল এসে পড়ে — ওগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পায় না সে।

আনিসিমের কথা লোকে ভুলতে শুরু করেছে। একদিন তার কাছ থেকে একটি চিঠি এল পদ্য করে মেলানো, মস্ত বড়ো একখান কাগজে সেই চমৎকার হস্তাক্ষরে আবেদন পত্রের মতো করে লেখা। বোঝা গেল তার সেই বন্ধু সামরোদভও ওর সঙ্গেই জেল খাটছে। পদ্যের নিচে কদর্য, প্রায় অপাঠ্য হিজিবিজিতে লেখা: 'আমার অসুখ করেছে, সর্বক্ষণ কষ্ট পাইতেছি, খৃষ্টের দোহাই কিছু সাহায্য পাঠাইয়ো।'

একদিন রোদ্দুরে ভরা শরতের বিকেলে বুড়ো ৎসিবুকিন গীর্জার সামনে বসেছিল। গরম কোটের কলারটা উলটিয়ে দেওয়ায় তার নাকের ডগাটুকু আর টুপির সামনেটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লম্বা বেঞ্চিটার অন্য প্রান্তে বসে ছিল ঠিকাদার ইয়েলিজারভ আর বছর সত্তর বয়সের ফোগলামুখো ইস্কুলের চৌকিদার ইয়াকভ। 'পেরেক' আর চৌকিদারে কথা কইছিল।

ইয়াকভ বলল বিরক্তভাবে, 'সন্তানের কর্তব্য বুড়োদের পালন করা... পিতামাতাকে ভক্তি করা। কিন্তু ঐ মেয়েটা, ওর ব্যাটার বৌ শ্বশুরকে তারই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা না পায় দুটো খেতে পরতে, না আছে যাবার মতো কোনো জায়গা। তিনদিন ধরে কিছুই খায়নি ও।'

'তিন দিন!' 'পেরেক' চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। আর ওইখানে ও বসেই আছে। কোনো কথাও বলে না। কথা বলার সামর্থ্যই নেই। কী হবে রেখে ঢেকে। ব্যাটার বৌয়ের নামে ওর মামলা আনা উচিত — আদালতে মাগীটার শাস্তি হয়ে যাক।'

'আদালতে কী হবে বললে?' চৌকিদারের কথাগুলো ঠিক শুনতে না পেয়ে জিগ্যেস করল 'পেরেক'।

'কী বলছে?'

'মেয়েটা নেহাৎ খারাপ নয়, খাটে খুব। তবে বলছি কি, ওই ছাড়া ... মানে একটু আধটু ব্যভিচার না করে তো মেয়েরা চলতে পারে না ...'

ইয়াকভ বলল রাগতভাবে, 'তাই বলে নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দেবে লোককে! আগে নিজের একটা বাড়ি করুক, তারপর সেখান থেকে যেন বার করে দেয়। ও নিজেকে কী ভেবেছে? রাক্ষুসী কোথাকার!'

ৎসিবুকিন ওদের কথাবার্তা শুনেও একটু নড়ল না।

'বাড়িখানা যদি একটু গরম থাকে আর মেয়েগুলো ঝগড়া না করে তাহলে বাড়িটা তোমার নিজের কি পরের তাতে কী এসে যায় বলো ...' 'পেরেক' নিজের মনে হাসল। 'যখন জোয়ান ছিলাম, তখন আমার বৌ নাসতাসিয়াকে বেশ লাগত। বেশ শান্ত শিষ্ট ছিল মেয়েটা। আর কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে লাগত আমার পেছনে, "একটা ঘর কেনো মাকারিচ, একটা বাড়ি কেনো। একটা ঘোড়া কেনো!" যখন মরছে তখনো সে বলেছে, "নিজের জন্যে একটা দ্রুজ্‌কি কেনো, মাকারিচ, পায়ে হে'টে আর কতো বেড়াবে।" আর আমি ওর জন্যে যা কিনেছি সে কেবল ওই মশলাদার বিস্কুট, বাস আর কিছু নয়।'

পেরেকের কথায় কান না দিয়েই ইয়াকভ বলে চলল, 'মেয়েটার স্বামীটা কালা আর ন্যালাবোকা। একেবারে খাঁটি ন্যালাবোকা। একটা হাঁসের চেয়ে একছিটে বেশি বুদ্ধিও নেই ছোঁড়াটার। কিছু যদি মাথায় ঢোকে ওর! হাঁসের মাথায় বাড়ি মারলেও হাঁস বুঝতে পারে না কী হচ্ছে।'

কারখানায় তার আস্তানায় যাবার জন্যে 'পেরেক' উঠে দাঁড়াল। ইয়াকভও উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল একসঙ্গে কথা বলতে বলতে। ওরা যখন গোটা পঞ্চাশেক পা এগিয়ে গেছে তখন বুড়ো ৎসিবুকিনও উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পেছু পেছু যেতে লাগল। যেতে গিয়ে পা টলছিল তার, যেন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

গোধূলির আলোয় ভরে উঠতে শুরু করেছে গ্রামটা। সাপের মতো এ'কেবে'কে যে রাস্তাটা চড়াই বেয়ে উঠে গেছে তার মাথায় এসে লেগেছে সূর্য। বন থেকে বুড়ির দল ফিরছে, তাদের পাশে ছুটে ছুটে চলেছে

ছেলেপিলেরা। সঙ্গে এদের ঝুড়ি ভর্তি ব্যাঙের ছাতা। স্টেশন থেকে বৌ-ঝিরা ফিরে আসছে। মালগাড়িতে ইঁট ভর্তি করার জন্যে ওরা গিয়েছিল। ওদের মুখে চোখে ইঁটের লাল লাল ধুলো লেগে আছে। গান গাইছে ওরা। তাদের সামনে আছে লিপা, গাইছে পঞ্চমে গলা তুলে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঢেউ তুলছে সুরে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সে খুশি হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে ভগবানের দয়ায় দিনটা শেষ হল এবার, এবার বিশ্রামের সময়। তার মা, দিন মজুরণী প্রাস্কোভিয়া হাঁটছে দলের সঙ্গে মিশে, হাতে তার একটি পুঁটলি। যেমন চিরকাল হাঁপায়, তেমনি হাঁপাচ্ছে।

'পেরেক'কে দেখে লিপা বলল, 'নমস্কার মাকারিচ, ভালো আছো তো?'

'নমস্কার, লিপা, সোনা আমার!' পেরেক জবাব দিল খুশিতে।

'ওগো মেয়েমাগীরা, এই বড়োলোক ছুতোর মিস্ত্রিটার কথা একটু ভেবো! আহা রে, বাছারা সব!' ('পেরেক' ফুঁপিয়ে উঠল।) 'আমার দামী দামী কুড়ুল রে!'

'পেরেক' আর ইয়াকভ চলে গেল। সকলেই শুনতে পাচ্ছিল ওরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। গোটা দলটার সম্মুখে এবার এসে পড়ল ৎসিবুকিন। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিকটা। লিপা আর তার মা ইতিমধ্যে পেছিয়ে গেছে দলের পেছন দিকে। বুড়ো লোকটা ওদের কাছাকাছি আসতে লিপা আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে বলল:

'নমস্কার গ্রিগরি পেত্রোভিচ!'

লিপার মাও অভিবাদন করল। বুড়ো দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওদের দিকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল তার, চোখ ভরে উঠল জলে। লিপা তার মায়ের পুঁটলি থেকে এক টুকরো খাবার তুলে দিল বুড়ো মানুষটার হাতে। ও নিল, নিয়ে খেতে শুরু করল।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। রাস্তার মাথাটাতেও আর এখন সূর্যাস্তের আভা নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া হাঁটতে শুরু করল তাদের গন্তব্যের দিকে। আর অনবরত ক্রুসচিহ্ন আঁকতে লাগল।

১৯০০

কনে

১

রাত দশটা বেজে গেছে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আচ্ছন্ন বাগানটা। শুমিনদের বাড়িতে ঠাকুমা মারফা মিখাইলভনার কথা মতো সান্ধ্য উপাসনা এইমাত্র শেষ হল। নাদিয়া এক মুহূর্তের জন্য বাগানে সরে এসেছিল। সেখান থেকে সে দেখল খাবারঘরে আহার্য সাজানো হচ্ছে আর ঠাকুমা তার ঢেউ-খেলানো রেশমী পোশাকে ঘরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। গীর্জার পাদ্রী ফাদার আন্দ্রেই কথা কইছেন নাদিয়ার মা নিনা ইভানভনার সঙ্গে। নিনা ইভানভনাকে জানালার মধ্য দিয়ে কৃত্রিম আলোয় কেন জানি না খুবই তরুণ দেখাচ্ছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ফাদার আন্দ্রেইয়ের ছেলে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ মনোযোগ দিয়ে শুনছে কথাবার্তা।

বাগানে শীতল নিস্তব্ধতা, প্রশান্ত ঘন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। বহুদূরে থেকে, বোধহয় শহরের বাইরে, ব্যাঙের ডাকের অস্পষ্ট শব্দ আসছে। বাতাসে মনোরম মে মাসের আভাস। দীর্ঘশ্বাস টেনে মনে মনে কল্পনা করে নেওয়া যায় — শহর ছাড়িয়ে দূরে কোথাও আকাশের নীচে, বৃক্ষচূড়ার ঊর্ধ্বে, বনে প্রান্তরে বসন্তের জীবন জাগছে, জাগছে সেই রহস্যময় চিত্তহারী মাধুর্যের জীবন, সেই শুচিশুদ্ধ ঐশ্বর্যময় জীবন পৃথিবীর দুর্বল পাতকী, মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। প্রায় কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

নাদিয়ার বয়স এখন তেইশ। ষোলো বছর বয়স থেকেই সে বিয়ের স্বপ্ন দেখছে গভীর আগ্রহে। এখন অবশেষে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের সঙ্গে, খাবারঘরে দাঁড়ানো ওই তরুণ পুরুষটির সঙ্গে তার বিবাহের বাগ্‌দান করা হল। তাকে পছন্দ হয়েছে নাদিয়ার। জুলাই মাসের সাত তারিখে বিয়ের দিন স্থির

হয়েছে। কিন্তু কোনো আনন্দ বোধ করছে না সে। ভালো ঘুম হচ্ছে না, সমস্ত ফুর্তি উল্লাস তাকে পরিত্যাগ করেছে ... মাটির নীচের রান্নাঘর থেকে খোলা জানালা দিয়ে তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার শব্দ, ছুরি কাঁটার ঝনঝনানি কানে আসছে। ভারী একটা ঝোলানো ভারে দরজাটা বন্ধ হয়। সেটা অনবরত দুমদাম করে বন্ধ হচ্ছে। টার্কির রোস্ট আর মসলাদার চেরির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে, সবকিছু এমনি করেই, একটুও না বদলে চলতে থাকবে আবহমান কাল ধরে।

একজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে দেউড়িতে এসে দাঁড়াল। সে আলেক্সান্দ্র তিমফেইচ, ওরফে সাশা — যে নামে সবাই তাকে ডাকে; সে এসেছে মস্কো থেকে দিন দশেক আগে, বেড়াতে। অনেককাল আগে মারিয়া পেত্রোভনা নাম্নী এক দরিদ্র, ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণ, রোগা ভগ্ন বিধবা নাদিয়ার ঠাকুমার কাছে বেড়াতে আসতেন; ওঁরা ছিলেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। বিধবা আসতেন যৎসামান্য সাহায্যের প্রত্যাশায়। তাঁরই ছেলে সাশা। কেন কে জানে লোকে বলত সে একজন উঁচুদরের শিল্পী; তার মা মারা গেলে ঠাকুমা তাঁর নিজ আত্মার সদগতির জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলেন মস্কোর কমিসারভ স্কুলে। দু' এক বছর বাদে সে বদলি হয়ে গেল একটি আর্ট স্কুলে, সেখানে সে কাটাল প্রায় বছর পনর। শেষ পর্যন্ত স্থপতি বিভাগ থেকে কোনোরকমে ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করে বেরুল। কোনোদিন সে স্থপতির কাজ করেনি, মস্কোর একটি লিথো কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। সে প্রায় প্রতি গ্রীষ্মে আসে, সাধারণত খুব অসুখ নিয়ে আসে, এসে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

তার গায়ে একটা গলাবন্ধ লম্বা কোট, পরনে জীর্ণ ক্যাম্বিসের পাৎলুন — তার প্রান্তভাগ ছিঁড়ে ক্ষয়ে গেছে। তার সার্টটা ইস্ত্রি করা নয়, আর সমস্ত চেহারা ও হাবভাব মলিন। কৃশ কাহিল তার দেহ, চোখদুটি বিশাল, হাড়সর্বস্ব সরু লম্বা আঙুলগুলি, মুখে দাড়ি, গায়ের রং ময়লা। কিন্তু এই সবকিছু নিয়েও সে সুদর্শন। শুমিনদের সংসারে সে নিজের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে আছে বলেই মনে করে, তাদের বাড়িতে সে থাকে নিজের বাড়ির মতোই। বেড়াতে এসে যে ঘরটায় সে থাকে সেটা বহুকাল সাশার ঘর বলেই পরিচিত হয়ে গেছে।

বারান্দা থেকে নাদিয়াকে দেখতে পেল সে, দেখে নেমে গেল তার কাছে।

বলল, 'চমৎকার জায়গাটা।'

'নিশ্চয়। শরৎকাল পর্যন্ত থাকা উচিত আপনার।'

'হ্যাঁ জানি। বোধহয় থাকতেই হবে। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকব আপনাদের সঙ্গে।'

স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই সে হাসল শব্দ করে, হেসে তার পাশে বসে পড়ল।

নাদিয়া বলল, 'এখানে বসে বসে মাকে দেখছিলাম। এখান থেকে কত কম বয়স দেখায়।' একটু থেমে আবার সে বলল, 'অবশ্য মার দুর্বলতা আছে জানি, কিন্তু তবু মা একটি আশ্চর্য মেয়ে।'

সাশা সায় দিল, 'হ্যাঁ, খুব চমৎকার উনি। আপন প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার মা সত্যি খুব ভালো আর দয়ালু, কিন্তু... কী ভাবে বলব কথাটা — আজ সকালে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম একটু আগেভাগে, দেখলুম চারটে চাকর ঠায় মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বিছানাপত্র কিছু নেই, কেবল কতকগুলো ন্যাকড়া বিছানো, তাতে একটা দুর্গন্ধ, অজস্র ছারপোকা আর আরশোলা ... বিশবছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি, সামান্য একটুখানিও বদলায়নি। ঠাকুমাকে দোষ দেওয়া যায় না, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার মা ফরাসী জানেন, সখের থিয়েটারের ভক্ত। মনে হয় তিনি কথাটা বুঝবেন।'

সাশা যখন কথা বলে তখন শ্রোতার দিকে দুটো লম্বা হাড়সর্বস্ব আঙুল তুলে রাখা তার অভ্যেস।

সে বলে চলল, 'এখানে সবকিছু আমার এমন অদ্ভুত লাগে। হয়ত আমি এতে অভ্যস্ত নই। হায় ভগবান, এখানে কেউ কিচ্ছুটি করে না! আপনার মা কিছু না করে সম্ভ্রান্ত ডাচেসের মতো ঘুরে বেড়ান, ঠাকুমা কিছুই করেন না, আপনিও না। আর আপনার বাগ্‌দত্ত আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ সেও করে না কিছু।'

নাদিয়া এই কথা গেল বছর শুনেছে, আগের বছরেও শুনেছে বলে মনে পড়ছে তার, এবং সে জানে শুধু এইভাবেই ও ভাবতে পারে। এককালে নাদিয়ার এসব কথা শুনে হাসি পেত কিন্তু এখন এসব শুনলে কেন যেন তার রাগ ধরে।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সেই পুরনো কথা, শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি। নতুন আর কিছু ভাবতে পারেন না?'

সাশাও উঠে পড়ল হেসে, তারপর দুজনেই ঘরে ফিরল। নাদিয়া সুদর্শনা, লম্বা, কৃশাঙ্গী। সাশার পাশে তাকে খুব সুসজ্জিতা এবং স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হচ্ছে। সে কথা সে নিজেও জানে, সেজন্য সাশার প্রতি সে দুঃখবোধ করে, আর নিজেকে মনে করে প্রায় অপরাধী বলে।

কিন্তু সে বলল, 'তাছাড়া অনেক বাজে কথা বলেন আপনি। দেখুন না, এইমাত্র আমার আন্দ্রেই সম্পর্কে কী বললেন। সত্যিই ওকে আপনি একবিন্দুও জানেন না!'

'আমার আন্দ্রেই ... ছেড়ে দিন আপনার আন্দ্রেইয়ের কথা। আপনার যৌবনের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ওরা যখন খাবারঘরে ঢুকল তখন খেতে বসছে সবাই। নাদিয়ার ঠাকুমা, বাড়ির সকলে তাঁকে ঠান্‌দি বলে ডাকে, জোরে জোরে কথা কইছেন। স্থূলাঙ্গী, সাদাসিধে বৃদ্ধা মহিলা, মোটা ঘন তাঁর ভ্রূ যুগল, ঠোঁটে একটু গোঁফ — গলার স্বর এবং কথা বলবার ভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনিই সংসারের আসল কর্ত্রী। বাজারে তাঁর একসারি দোকানঘর আছে, এই থামওয়ালা প্রাচীন বাড়িটা আর বাগান তাঁরই, তবু প্রত্যেকদিন সকালে চোখের জলে ভেসে তিনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর তাঁকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করুন। তাঁর পুত্রবধূ এবং নাদিয়ার মা নিনা ইভানভনা, ফাদার আন্দ্রেই এবং তাঁর পুত্র ও নাদিয়ার বাগ্‌দত্ত আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ — তিনজনে সংবেশন বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। নিনা ইভানভনা শ্বেতাঙ্গিনী, চুলগুলো সোনালী, গায়ে আঁটো করে আঁটা কাঁচুলি, চোখে পাঁশনে চশমা এবং হাতের সবকটা আঙুলে হীরের আংটি। ফাদার আন্দ্রেই শীর্ণকায় দন্তহীন বৃদ্ধ, সব সময় তাঁকে দেখে মনে হয় যে এখ্‌খুনি যেন কিছু একটা মজার কথা বলবেন। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ হৃষ্টপুষ্ট প্রিয়দর্শন যুবক, কোঁকড়া চুলগুলি দেখে বরং অভিনেতা কিংবা শিল্পী বলে মনে হয়।

ঠাকুমা বললেন সাশাকে, 'সাতদিনে তুমি মুটিয়ে যাবে এখানে। কিন্তু আরো খেতে হবে তোমাকে। নিজের দিকে তাকিয়ে একবার দেখো দিখি!'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন ঠাকুমা। 'তোমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। আসল একটি উড়নচণ্ডী, তুমি ঠিক তাই।'

চোখ পিট্ পিট্ করে, কথাগুলো ধীরে ধীরে টেনে টেনে জুড়ে দিয়ে ফাদার আন্দ্রেই বললেন, 'পৈত্রিক দান খুইয়ে সে বোকা জন্তুদের সঙ্গে মাঠে মাঠে চরে বেড়াত।'

বাপের কাঁধ চাপড়ে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বলল, 'বুড়ো বাবাকে ভালোবাসি আমি। লক্ষ্মী বাবা আমার। খাসা বুড়া আদমী!'

কেউ কিছু বলল না। সহসা সাশা জোরে হেসে উঠল, ন্যাপকিনটা চাপা দিল ঠোঁটে।

ফাদার আন্দ্রেই নিনা ইভানভনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে সংবেশন বিদ্যায় বিশ্বাস করেন আপনি?'

নিনা ইভানভনা জবাব দিলেন, 'ঠিক বিশ্বাস করি তা বলা যায় না।' তাঁর মুখে গম্ভীর, প্রায় কঠোর একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল। 'কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রকৃতিতে এমন বহু কিছু আছে যা রহস্যজনক এবং বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।'

'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, তবু আমি এও বলব যে, ধর্মবিশ্বাস বহু পরিমাণে এই রহস্যের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়।'

একটা প্রকাণ্ড রসালো টার্কি রাখা হল টেবিলে। ফাদরে আন্দ্রেই এবং নিনা ইভানভনা তাঁদের আলাপ চালিয়ে যেতে থাকলেন। নিনা ইভানভনার হাতের আঙুলে হীরেগুলি জ্বলজ্বল করতে লাগল, তারপর চোখে ঝিকমিক করে উঠল অশ্রু। তাঁর মনে গভীর নাড়া লেগেছে।

তিনি বললেন, 'আমি অবশ্য আপনার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠব না, সে সাহসও আমার নেই। কিন্তু আপনিও স্বীকার করবেন জীবনে অনেক প্রহেলিকা আছে যার কোনো ব্যাখ্যা মীমাংসা হয় না।'

'না, আমি বলছি আপনাকে, একটিও নেই।'

আহারের পর আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বেহালা বাজাল, নিনা ইভানভনা তার সঙ্গে পিয়ানোয় সঙ্গত করলেন। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ দশবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিদ্যা বিভাগের গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনো চাকরি-বাকরি করে না, নির্দিষ্ট কোনো কাজও তার নেই। মাঝে মাঝে কেবল

'সাহায্য রজনীর' ঐকতান বাদনে সে বেহালা বাজায়। শহরে তাকে লোকে বলে 'ওস্তাদ'।

আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের বাজনা নীরবে সবাই শুনল। টেবিলের উপর নিঃশব্দে সামোভার থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে, আর চা খাচ্ছে একমাত্র সাশা। ঠিক বারোটা যখন বাজল বেহালার একটি তার গেল ছিঁড়ে। প্রত্যেকে হেসে উঠল, তারপর পড়ে গেল বিদায় গ্রহণের ব্যস্ততা।

বাগদত্তের কাছে শুভরাত্রি জানিয়ে নাদিয়া উঠে গেল দোতলার ঘরে। সেখানে সে থাকে মায়ের সঙ্গে (একতলাটায় থাকেন ঠাকুমা)। নীচে, খাবারঘরে আলোগুলি একে একে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সাশা তবু বসে রইল, বসে চা খেতে লাগল। বরাবরই সে চা নিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ মস্কোর কায়দায়, আর একের পর এক ছয় সাত গেলাস চা খেয়ে যায়। সাজপোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার অনেকক্ষণ পরেও নাদিয়া শুনতে পাচ্ছিল চাকরবাকরগুলো টেবিল সাফ করছে আর ঠাকুমা গজ্ গজ্ করে যাচ্ছেন। অবশেষে নিঝুম হল বাড়িটা, কেবল, নীচের তলায় সাশার ঘর থেকে মাঝে মাঝে জোরে জোরে কাশির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

২

নাদিয়া যখন জেগে উঠল তখন বোধ হয় দুটো হবে, রাত ভোর হয়ে আসছিল। দূরে রাত-পাহারার ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। ঘুমবার ইচ্ছে ছিল না নাদিয়ার, শয্যা তার এত হাল্‌কা নরম মনে হচ্ছিল যে আরাম করে শোয়া যায় না। এই মে মাসে আগের আগের রাত্রিগুলির মতো আজও নাদিয়া বিছানায় উঠে বসল, তারপর চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দিল। আগের রাত্রির মতো সেই একই একঘেয়ে, তুচ্ছ, অসাড়, অদম্য চিন্তা — আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের পূর্বরাগের কথা, কেমন করে সে তার পাণি প্রার্থনা করেছে, কেমন করে সে নিজে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে এই সৎ ও চতুর যুবকটির গুণের আদর করতে শিখেছে সেই সব চিন্তা। কিন্তু কী কারণে যেন, আজ যখন বিয়ের মাত্র আর একমাস বাকী, সে একটা ভয়, একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন তার বরাতে অনির্দিষ্ট একটা দুঃখ আছে।

'টিক-টক, টিক-টক,' চৌকিদার মন্থর শব্দ করে চলেছে, 'টিক-টক .'

সাবেকি ধরনের প্রকান্ড জানালাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগান, খানিকটা ছাড়িয়ে লাইলাকের ঝোপ। ফুলভারে সেটা ভারাক্রান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, ঠান্ডা হাওয়ায় অবসাদগ্রস্ত। ধীরে নিঃশব্দে ফুলগুলির ওপর নেমে এল ঘন সাদা একটা কুয়াশা, যেন ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলতে সে ব্যগ্র। দূরে দূরে গাছের শাখায় ডাকছে অলস তন্দ্রামগ্ন বুক পাখিরা।

'হা ভগবান, এমন মন খারাপ লাগছে কেন আমার?'

বিয়ের আগে সব মেয়েরই কি এরকম হয়ে থাকে? কে জানে? না কি এ সাশার প্রভাব? কিন্তু সাশা তো সেই একই কথা যেন মুখস্থ করে বলে গেছে বার বার, বছরের পর বছর, আর সে যা বলেছে সবই বরাবর কেমন নির্বোধ আর অদ্ভুত লেগেছে। কিন্তু কেনই বা সে মাথা থেকে সাশার চিন্তাটা দূর করতে পারছে না? কেন?

বহুক্ষণ চৌকিদারের রোঁদ শেষ হয়েছে। জানালার নীচে এবং বাগানে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। বাগানের কুয়াশাটা কেটে গেল, সবকিছু বসন্ত রোদ্রে স্বর্ণাভ হয়ে উঠল, সব যেন হাসতে লাগল। দেখতে দেখতে সারা বাগানটি সূর্যরশ্মির আলিঙ্গনে উষ্ণ হয়ে যেন প্রাণ পেল, পাতায় পাতায় শিশির-বিন্দু হীরের মতো দীপ্তিময় হয়ে উঠল। আর সেই জীর্ণ পুরাতন তুচ্ছ অবহেলিত বাগানটা এই প্রভাতবেলায় সজীব জীবন্ত, উল্লসিত হয়ে উঠল।

ঠাকুমা আগেই জেগেছেন। সাশা সেই তার গম্ভীর কর্কশ কাশি কাশছে। নীচে শোনা যায় চাকরবাকরেরা সামোভার আনছে, চেয়ারগুলো টানাটানি করছে।

সময় কেটে যায় ধীরে ধীরে। নাদিয়া ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ থেকে পায়চারি করছে বাগানে। তবুও সকালটা যেন কাটতে চায় না।

এবারে এলেন নিনা ইভানভনা জলভরা চোখে আর হাতে এক গেলাস সোডা নিয়ে। তাঁর বাতিক আধ্যাত্মিকতা আর হোমিওপ্যাথি। প্রচুর পড়েছেন. তাঁর নিজের সন্দেহের কথাগুলো বলতে ভালোবাসেন। নাদিয়ার মনে হয় এই সবকিছুর মধ্যে যেন একটা গভীর, রহস্যময় তাৎপর্য আছে। মাকে চুমু খেয়ে সে তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'কাঁদছিলে কেন মা?'

'কাল রাতে একটা বই পড়েছি, এক বৃদ্ধ আর তার মেয়ের কাহিনী। বুড়ো কাজ করত কী একটা অফিসে, তারপর জানো কী হল, অফিসের বড়কর্তা বুড়োর মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল — বইটা শেষ হয়নি, কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছি যে আর কান্না সামলাতে পারিনি।' বলে নিনা ইভানভনা গেলাস থেকে এক ঢোক জল খেলেন। 'সকালে আবার মনে পড়ে গেল গল্পটা, তাই কেঁদে ফেলেছি আবার।'

নাদিয়া একটুখানি থেমে বলল, 'আর আমি এমন মনমরা হয়ে আছি আজকাল। ঘুমুতে পারছি না কেন?'

'জানি না বাছা। কিন্তু আমার যখন ঘুম আসে না তখন আমি শক্ত করে চোখ বুজে থাকি — এই, এই রকম করে — আর কল্পনা করি আন্না কারেনিনাকে দেখতে ছিল কেমন, কেমন করে সে কথা বলত, কিংবা কিছু একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, পুরাকালের কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করি ...'

নাদিয়া অনুভব করল মা তাকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারেন না, সে ক্ষমতা নেই তাঁর। এরকম একটা অনুভূতি এর আগে আর দেখা দেয়নি। সে ভয় পেয়ে গেল। তার লুকোতে ইচ্ছা করল। নিজের ঘরে সে ফিরে গেল।

দুটোর সময় খেতে বসল সবাই। আজ বুধবার, উপোসের দিন। ঠাকুমাকে খেতে দেওয়া হল নিরামিষ 'বর্শ' এবং ব্রীম মাছের সঙ্গে বাকহুইটের পরিজ।

ঠাকুমাকে চটাবার জন্য সাশা 'বর্শ'ও খেল, মাংসের সুপও খেল। খেতে খেতে সারাটা সময় সে হাসি-মস্করা করে চলল, কিন্তু তার সব ঠাট্টাই অতিরিক্ত বিস্তারিত, সব সময় তা একটা নীতিকথার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া কোনো একটি রসিকতা করার আগে সে যখন লম্বা অস্থিসার, মড়ার মতো আঙুলগুলো তুলে ধরে তখন ব্যাপারটা মোটেই আর মজাদার থাকে না। তার ওপর যখন হঠাৎ মনে পড়ে সে অত্যন্ত অসুস্থ এবং সম্ভবত আর বেশি বাঁচবে না, তখন এমন দুঃখ হয় তার জন্য যে কান্না পায়।

খাওয়ার পর ঠাকুমা চলে গেলেন তাঁর ঘরে বিশ্রাম নিতে। একটুক্ষণ পিয়ানো বাজালেন নিনা ইভানভনা, তারপর তিনিও ঘর ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

আহারের পরে যে বিষয়টি নিয়ে সাশা বরাবর কথা বলে, তা নিয়েই সে

বলল, 'আঃ, নাদিয়া লক্ষ্মীটি, শুধু যদি আমার কথা শুনতেন! যদি শুনতেন আপনি!'

সাবেকি ফ্যাশনের একখানা কেদারায় গুটিশুটি মেরে বসে নাদিয়া চোখ বুজল, আর সাশা নীরবে ঘরে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

সে বলল, 'এখান থেকে যদি কেবল চলে যেতেন আপনি, আর পড়াশুনা করতেন। শিক্ষিত সাধু লোকেরাই আকর্ষণের বস্তু, একমাত্র তাদেরই জগতে প্রয়োজন আছে। আর এমন লোক যত বেশি হবে পৃথিবীতে তত দ্রুত স্বর্গরাজ্য আসবে। তখন কোনোরকম প্রচেষ্টাই বাদ যাবে না, আপনাদের এই শহরে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাবে, সবই বদলে যাবে যেন যাদুমন্ত্রে। আর তারপর গড়ে উঠবে বিশাল চমৎকার সব বড় বড় বাড়ি, সুন্দর সুন্দর পার্ক, আশ্চর্য সব ফোয়ারা, আর কত সব চমৎকার লোক ... কিন্তু তাও আসল কথা নয়। মূল কথাটা হচ্ছে, তখন আর কোনো ভিড় থাকবে না, এখন আমরা ভিড় বলতে যা বুঝি তখন থাকবে না, বর্তমানের এই পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ তখন প্রত্যেকটি ব্যক্তির মনে প্রত্যয় দেখা দেবে, তারা জানবে জীবনের লক্ষ্য কী। কেউ আর তখন ভিড়ের কাছ থেকে সমর্থন চাইবে না। লক্ষ্মীটি, এখান থেকে চলে যান আপনি — ওদের সবাইকে দেখিয়ে দিন যে এই নিস্তরঙ্গ নিরানন্দ, বিকৃত জীবন আপনার অসহ্য হয়ে উঠেছে — অন্তত নিজেকে তো দেখিয়ে দিন।'

'না, সাশা, তা আমি পারি না। আমার বিয়ে হতে চলেছে।'

'ও কথা ভাববেন না! তাতে কী আসে যায়?'

বাগানে গিয়ে ওরা ইতস্তত পায়চারি করতে লাগল।

সাশা বলে চলল, 'সে যাই হোক, নাদিয়া, আপনাকে ভেবে দেখতেই হবে, বুঝতে হবে, আলস্যের জীবন কী বীভৎস, কী অন্যায়। আপনি কি দেখতে পান না যে আপনার, আপনার মায়ের, আপনার ঠাকুমার আরামে আলস্যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিতে আর সবাইকে কাজ করতে হয়? দেখতে পান না যে অন্যান্যের জীবন গ্রাস করে ফেলছেন আপনারা? তা কি ন্যায়সঙ্গত? বলুন, তা কি কলুষিত নয়?'

নাদিয়া বলতে চাইছিল, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' বলতে চাইছিল,

হ্যাঁ, সে বুঝেছে সব। কিন্তু তার চোখ ভরে জল এল, সে নীরব হয়ে গেল, আর যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল নিজের মধ্যে। নিজের ঘরে চলে গেল নাদিয়া।

সন্ধ্যায় এল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ আর বরাবরের মতো অনেকক্ষণ ধরে বেহালা বাজাল। সে স্বভাবতই স্বল্পভাষী, আর বোধ হয় বাজাবার সময় কথা বলতে হয় না বলেই বেহালাটাকে সে ভালোবাসে। দশটার কিছু পরে বাড়ি যাবার জন্য কোটটি গায়ে দেওয়া হলে সহসা সে জড়িয়ে ধরল নাদিয়াকে আর তার মুখে, কাঁধে, হাতে প্রবল আবেগে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগল।

মৃদু স্বরে সে বলল, 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!' ওঃ, আজ আমি ভারী সুখী! মনে হয় আনন্দে পাগল হয়ে যাব!'

এ সব কথাও যেন নাদিয়া শুনেছে অনেক অনেক কাল আগে, বা পড়েছে কোনো একটা উপন্যাসে, কোনো পুরনো জীর্ণ একটা বইয়ে— যা আজকাল কেউ আর পড়ে না।

খাবারঘরে টেবিলের সামনে বসে সাশা পিরিচ থেকে চা খাচ্ছে, পিরিচটা তার লম্বা পাঁচ আঙুলের ডগায় স্থির করে বসানো। ঠাকুমা তাসে পেশেন্স খেলছেন। নিনা ইভানভনা পড়ছেন। আইকনের সামনে প্রদীপের শিখাটা পিট পিট করছে। সবকিছু যেন শান্ত, নিশ্চিত, নিরুদ্বেগ। নাদিয়া তাদের শুভরাত্রি কামনা করে উঠে চলে গেল তার ঘরে, আর বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক আগের দিনের মতো উষার প্রথম আভাসে সে জেগে উঠল। ঘুমুতে পারল না সে, হৃদয়ের ওপর কিছু একটা ভারী আর অশান্ত যেন চেপে রয়েছে। উঠে বসে হাঁটুতে মাথা রেখে সে ভাবতে লাগল তার বাগদত্তের কথা, বিবাহের কথা... কেন যেন তার মনে এল তার মা স্বামীকে ভালোবাসতেন না, এখন তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই, সম্পূর্ণ অধীন তিনি তাঁর শাশুড়ীর—ঠাকুমার, কিন্তু নাদিয়া যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই সে বুঝতে পারল না কেন সে তার মাকে দেখেছে বিশিষ্ট অসাধারণ রূপে, দেখতে পায়নি যে তিনি একজন অতি সাধারণ, অভাগিনী মহিলা।

নীচের তলায় সাশাও জেগে, এখান থেকে সে তার কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অদ্ভুত, অতি সরল একটা লোক, নাদিয়া ভাবল; তার স্বপ্নের মধ্যে, ওই সব অপূর্ব বাগানের মধ্যে, আশ্চর্য সুন্দর ফোয়ারার মধ্যে অসম্ভব উদ্ভট কিছু আছে। কিন্তু তার সেই মূঢ় সরলতায়, তার অসঙ্গতির মধ্যেই এমন

অনেক কিছু আছে যা রমণীয়। নাদিয়া যখনই চিন্তা করতে লাগল তার এখান থেকে চলে গিয়ে পড়াশুনো করা উচিত কিনা, সেই মুহূর্তে তার সমস্ত হৃদয়, তার পূর্ণ সত্তাটি যেন সজীব একটি শীতলতায় অবগাহন করে উঠল, আর আশ্চর্য একটি হর্ষোচ্ছ্বাসে সে নিমগ্ন হয়ে গেল।

'না, ভাববো না...' ফিসফিস করে সে বলল, 'ও কথা না ভাবাই ভালো।'

'টিক-টক,' শব্দ করে চলল রাত্রির চৌকিদার। 'টিক-টক ... টিক-টক ...'

■

জুন মাসের মাঝামাঝি সাশা হঠাৎ ক্লান্তিতে বিরক্তিতে অভিভূত হয়ে উঠল, মস্কো ফিরে যাবার কথা বলতে লাগল।

মনমরা হয়ে সে বলল, 'এ শহরে আমি থাকতে পারি না। কলের জল নেই, নর্দমা নেই! খাবারগুলো আমার গলা দিয়ে নামতেই চায় না। রান্নাঘরটা এমন নোংরা যে বর্ণনা করা যায় না ...'

ঠাকুমা বললেন ফিসফিস করে, 'আর কটা দিন থেকে যা উড়নচণ্ডী ছেলে। বিয়ে সাত তারিখে।'

'না, পারি না কিছুতেই!'

'বলেছিলে সেপ্টেম্বর মাস অবধি আমাদের কাছে থাকবে।'

'এখন আর তা চাইনে। আমায় কাজ করতে হবে!'

গ্রীষ্মটা সেবার ঠাণ্ডায় আর বাদলে ভরা। গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে সর্বদা, বাগানটাকে দেখাচ্ছে কেমন যেন থমথমে মনমরা। এখান থেকে চলে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছেটা তাই নিতান্ত স্বাভাবিক। ওপরে, নীচে, সব ঘরগুলোতে অপরিচিত নারীকণ্ঠ শোনা যায়, ঠাকুমার ঘরে ঝকর ঝকর করে চলেছে একটা সেলাই-এর কল। এ সবই নববধূর সাজসজ্জা প্রস্তুতিপর্বের অঙ্গ। কেবল শীতের কোটই নাদিয়া পাবে ছয়খানা, আর তার মধ্যে সব থেকে যেটা শস্তা, ঠাকুমা গর্ব করে বলেন, তারই দাম তিনশ রুবল। এই সব হুজুগ আড়ম্বর দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে সাশার। নিজের ঘরে বসে মনে মনে সে গুমরে মরে। কিন্তু সবাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করালো থেকে যেতে। সে কথা দিল পয়লা জুলাই-এর আগে যাবে না।

সময় কেটে গেল দ্রুত গতিতে। সেন্ট পিটারের বার্ষিকী দিবসে খাওয়া দাওয়ার পর আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ নাদিয়াকে নিয়ে গেল মস্কো স্ট্রীটে, আর একবার সেই বাড়িটাতে চোখ বুলিয়ে আসার জন্য, অনেক আগে নব-দম্পতির জন্য সেটা ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িখানা দোতলা, এখন পর্যন্ত কেবল ওপর তলাটাই সাজানো হয়েছে আসবাবপত্রে। বল-নাচের ঘরে চকচকে মেঝেটায় রঙ্গালয়ের মতো রং লাগানো হয়েছে, রয়েছে বাঁকানো কাঠের চেয়ার, একটা জমকালো পিয়ানো, আর বেহালাটার জন্য একটি সঙ্গীত-মঞ্চ। ঘরে রং-এর গন্ধ পাওয়া যায়। দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে একখানা বড় তৈলচিত্র—হাতলভাঙা বেগুনী রঙের ফুলদানীর পাশে দাঁড়ানো একটি নগ্ন নারীর ছবি। 'চমৎকার ছবি,' সশ্রদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাসের পর বলল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ। 'এটি শিশ্মাচেভস্কির আঁকা।'

এর পর বৈঠকখানা। সেখানে রয়েছে একটি গোল টেবিল, একখানা সোফা, আর কয়েকখানা উজ্জ্বল নীল রঙের আরাম কেদারা, গদিআঁটা। সোফার ওপরটাতে ঝুলছে আন্দ্রেইয়ের বাবার বড় একখানা ফটো। বাবার বুকে সবগুলি পদক লাগানো আর মাথায় লম্বা একটি পুরোহিতের টুপি। ওরা এল খাবারঘরে, ঘরের পাশে আহার্য রাখবার আলমারী একটি। খাবারঘরের পরে শোবার ঘর। এখানে আবছা আলোয় পাশাপাশি রয়েছে দুটি শয্যা। দেখে মনে হয় যেন এই ঘর যারা সাজিয়েছে তারা ধরেই নিয়েছে এখানকার জীবন চিরকাল আনন্দেই কাটবে, ধরে নিয়েছে এখানে অন্যরকম কিছু হতে পারে না। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ ঘরগুলোতে নাদিয়াকে ঘুরিয়ে আনল, একবারও তার কোমর থেকে হাতখানা সরিয়ে নেয়নি। আর নাদিয়া দুর্বল, অপরাধী বোধ করল নিজেকে, এই সব ঘর আর শয্যা আর চেয়ার দেখে ঘেন্না লাগল তার, আর সেই নগ্ন নারীর চিত্র তাকে পীড়িত করে তুলল। এবার সে স্পষ্ট বুঝতে পারল: আন্দ্রেই আন্দ্রেইচকে আর সে ভালোবাসে না, বোধ হয় কোনো দিনই ভালোবাসেনি তাকে। কিন্তু সে জানে না কী করে বলা যায় একথা, কাকে বলা যায়, আর আদৌ কেনই বা বলতে হবে এই কথাটা। দিন রাত্রি সে ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে, তবু কিছুই কিনারা করতে পারল না সে ... আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের বাহু তার কোমর বেষ্টন করে ছিল, সে তার সঙ্গে কথা বলছে অত্যন্ত সহৃদয়তায় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। নিজের বাড়িতে সে ঘুরে বেড়িয়েছে

কী রকমই না খুশি হয়ে। কিন্তু নাদিয়ার চোখে সবকিছু নীচ আর অমার্জিত লাগল — একটা নির্বোধ, মূঢ়, অসহ্য নীচতা! কোমর বেষ্টন করা ওই বাহুখানা মনে হয়েছিল কঠিন, ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত, একটা লোহার বেড়ির মতো। যে কোনো মুহূর্তে সে ছুটে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত, প্রস্তুত কান্নায় ভেঙে পড়তে, জানালা দিয়ে লাফাতে। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ তাকে নিয়ে এল স্নানঘরে, দেওয়ালে গাঁথা কলের মুখ খুলল, জল বেরিয়ে এল হুড়মুড় করে।

'দেখলে? কেমন লাগল?' বলে সে হাসল। 'ওদের বলে একটা চৌবাচ্চা বসিয়েছি, তাতে একশ বালতি জল ধরবে, আর চানের ঘরে আমরা কলের জল পাব।'

দুজনে উঠোনে একটু হেঁটে বেড়ালো, তারপর রাস্তায় পা দিয়ে উঠল এসে একটা ভাড়া গাড়িতে। মেঘের মতো ঘন হয়ে ধুলো উড়ছিল, মনে হচ্ছিল এখ্খুনি বৃষ্টি হবে।

ধুলো থেকে বাঁচিয়ে চোখদুটো কুঁচকে ছোটো করে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ প্রশ্ন করল, 'ঠাণ্ডা লাগছে তোমার?'

নাদিয়া জবাব দিল না।

একটুক্ষণ থেমে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বলল, 'আমি কিছু কাজকর্ম করি না বলে কাল সাশা আমাকে ভর্ৎসনা করছিল মনে আছে? বুঝলে, সে কিন্তু ঠিকই বলেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অসংখ্য বার ঠিক। আমি কিছুই করি না, আর জানিও না কিছু করতে। কেন বলতে পারো, লক্ষ্মীটি? কোনো একদিন টুপিতে ফিতে লাগিয়ে কোনো একটা আফিসে কাজ করতে যাব, একথা মনে হলেই আমার গায়ে জ্বর আসে কেন? উকীল, কিংবা লাটিনের মাস্টার অথবা পৌর-সভার সদস্য — এদের দেখে পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না কেন? ও জন্মভূমি রাশিয়া, ওগো আমার মা রাশিয়া! কত যে অলস অকর্মা অপদার্থকে এখনো তোমার বুকে স্থান দিয়ে রেখেছ! ওগো দুখিনী মা, আমার মতো আর কতগুলো!'

নিজের নিষ্কর্ম আলস্য নিয়ে সে খুব তত্ত্বকথা বলতে লাগল। সে মনে করে — এটাই এ যুগের হাওয়া।

সে বলে চলল, 'আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা পল্লীতে চলে যাব, বুঝলে সোনা, তখন আমরা কাজ করব। বাগান আর একটি ছোটো নদী

সমেত অল্প একটু জমি কিনব, আর সেখানে মেহনত করব, জীবন দেখব আঃ কী চমৎকার হবে!'

মাথা থেকে টুপিটা সে খুলে নিল, বাতাসে কাঁপতে লাগল তার চুলগুলি, আর মেয়েটি তার কথা শুনে চলল ভাবতে ভাবতে, 'ভগবান, বাড়ি যেতে চাই। ও ভগবান!' নাদিয়াদের বাড়িতে ফিরে আসবার ঠিক আগে ফাদার আন্দ্রেইকে ওরা ধরে ফেলে পেছনে রেখে এল।

'ওই যে দেখ আমার বাবা!' সোল্লাসে বলল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ, আর টুপি নাড়াতে লাগল। 'বুড়ো বাপকে আমি ভালোবাসি, সত্যি ভালোবাসি।' গাড়িটার ভাড়া চুকিয়ে দিল সে। 'লক্ষ্মী বাবা আমার! চমৎকার বুড়া আদমী!'

নাদিয়া বাড়ি ঢুকল। মেজাজ বিগড়ে গেছে। শরীরটা তার অসুস্থ বোধ হতে লাগল। সে ভুলতে পারল না সন্ধ্যায় অতিথি অভ্যাগতরা সব আসবেন। তাকে তাঁদের আপ্যায়ন করতে হবে, হাসতে হবে, বেহালা শুনতে হবে, শুনতে হবে যত সব বাজে কথা আর বলতে হবে কেবল বিয়ে বিয়ে বিয়ের কথা, অন্য কিছু নয়। ঠাকুমা রেশমী পোশাক পরে জাঁক করে বসে আছেন সামোভারের পাশে আড়ষ্ট হয়ে; ভয়ানক উদ্ধত দেখাচ্ছে, অতিথি অভ্যাগত সমাগম হলে যেমন তাঁকে দেখায় বরাবর। ফাদার আন্দ্রেই প্রবেশ করলেন মুখে তাঁর সূক্ষ্ম হাসিটি নিয়ে।

ঠাকুমাকে তিনি বললেন, 'আপনাকে সুস্থ দেখে আনন্দ হচ্ছে, পুণ্যময় সান্ত্বনা পাচ্ছি।' কথাটা তিনি অকপট আন্তরিকতা নিয়ে বললেন, না ঠাট্টা করে—বলা শক্ত।

৪

বাতাস খট খট করছে জানালার শার্সিতে আর গৃহশীর্ষে। শন্ শন্ শব্দ শোনা যায়, চিমনীতে ঘরো-ভূতটা বিষণ্ণ বিলাপে গুন গুন করছে। রাত একটা। সবাই শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে নেই কেউ। নাদিয়া ভাবতে লাগল সে যেন নীচতলায় বেহালার বাজনা শুনতে পাচ্ছে। বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ন আওয়াজ পাওয়া গেল, একটা খড়খড়ি নিশ্চয় সশব্দে খুলে গেল। এক মিনিট বাদে শেমিজ গায়ে নিনা ইভানভনা ঘরে এলেন হাতে একটি বাতি নিয়ে।

বললেন, 'ওটা কিসের শব্দ, নাদিয়া?'

নাদিয়ার মায়ের চুলগুলো একটা বিনুনি করে বাঁধা, ভয়ে ভয়ে তিনি একটু হাসছেন; আজ এই ঝড়ের রাতে তাঁকে অনেকটা বেশি বয়স্কা, অনেকটা বেঁটে এবং বরাবরের তুলনায় অনেক সাধারণ দেখাচ্ছে। নাদিয়ার মনে পড়ল, এই তো সম্প্রতি মাকে সে কেমন অসামান্যা এক নারী বলে মনে করেছিল, তাঁর কথাবার্তা শুনে সে কত গর্ব বোধ করত। কিন্তু এখন সে কিছুতেই মনে করতে পারল না সেই কথাগুলো কী — মনে যা এল তা সবই দুর্বল, কৃত্রিম।

চিমনীর মধ্যে যেন কয়েকটি মোটা, টানা গলায় গান হচ্ছে, এমনকি যেন 'হে ভগবান' কথাটা পর্যন্ত কানে শোনা যায়। নাদিয়া বিছানায় উঠে বসে জোরে জোরে চুলগুলি টানতে লাগল, আর কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কেঁদে কেঁদে সে বলল, 'মা, ও মা! মাগো, আমার যে কী হচ্ছে যদি জানতে পারতে মা! আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও মা — তোমার পায়ে পড়ি!'

বিহ্বল হয়ে নিনা ইভানভনা বললেন, 'কোথায়?' তারপর বিছানার পাশে বসে বললেন, 'কোথায় যেতে চাও?'

নাদিয়া কাঁদল, কেঁদেই চলল, একটাও কথা আর বলতে পারল না।

অবশেষে সে বলল, 'এই শহর থেকে আমায় চলে যেতে দাও। বিশ্বাস করো, এই বিয়েটা হবে না, হতে পারে না। ওকে আমি ভালোবাসি না ... তার সম্বন্ধে কথা বলাও আমার সহ্য হয় না।'

আতঙ্কে নিনা ইভানভনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, 'না, খুকী না। শান্ত হও। তুমি উতলা হয়ে গেছ। ও কেটে যাবে' খন। ওরকম হয়েই থাকে। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ বোধ হয়, কিন্তু প্রেমের ঝগড়া তো শেষ হয় চুমুতে।'

নাদিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'যাও, তুমি চলে যাও মা!'

একটু থেমে নিনা ইভানভনা বললেন, 'হ্যাঁ। এই তো সেদিনের কথা, ছিলে ছোট্ট খুকীটি আর আজ তো প্রায় বিয়ের কনে। প্রকৃতিতে অহরহ পরিবর্তন ঘটছে। কী ঘটল বোঝার আগেই একদিন মা হয়ে উঠবে তুমিই, তারপর বুড়ি, মেয়ে নিয়ে দুর্ভোগ ভুগবে আমার মতো।'

নাদিয়া বলল, 'মা মণি, তুমি কত দয়াময়ী, কত বুদ্ধি তোমার, কিন্তু তুমি অসুখী। বরাবর তুমি এমন দুখিনী। মা, তুমি এমন মামুলি কথাগুলো বলো কেন? কেন বলো, ঈশ্বরের দোহাই, কেন বলো?'

নিনা ইভানভনা কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে গেলেন চলে। আবার চিমনীর মধ্যে সেই মোটা কয়েকটা গলা বিলাপ করে উঠল। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল নাদিয়া। বিছানা থেকে লাফিয়ে সে ছুটে গেল মায়ের কাছে। নিনা ইভানভনার চোখদুটো ফুলে উঠেছে কান্নায়। নীল একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন তিনি। হাতে একটা বই।

নাদিয়া বলল, 'মা, শোনো। একটু ভেবে দেখ, আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো, তোমার পায়ে পড়ি! একটু কেবল ভেবে দেখ আমাদের এই জীবন কী রকম ক্ষুদ্র সংকীর্ণ, কী রকম অবমাননাকর জীবন! আমার চোখ খুলে গেছে, এখন আমি সব দেখতে পাচ্ছি। আর তোমার আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ? কী বলব, একটুও সে চালাক চতুর নয়, মা। হায় ঈশ্বর, হে ভগবান! মাগো, একটুখানি ভেবে দেখ; ভারি সে বোকা!'

একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলেন নিনা ইভানভনা।

ফুঁপিয়ে হাঁপিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি আর তোমার ঠাকুমা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছো। আমি বাঁচতে চাই! হ্যাঁ, বাঁচতে! বার বার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'বাঁচতে চাই! আমাকে মুক্তি দাও! আমার এখনো বয়স আছে, বাঁচতে চাই আমি, আর তোমরা আমাকে বুড়ি বানিয়ে দিয়েছ!'

তিক্ত কান্নায় ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর কম্বল জড়িয়ে গুটি শুটি হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে মূঢ়, করুণ, ক্ষুদ্র একটা প্রাণীর মতো দেখাতে লাগল। নাদিয়া নিজের ঘরে ফিরে সাজপোশাক পরে নিল, তারপর জানালার কাছে বসে রইল প্রভাতের প্রতীক্ষায়। সারা রাত সে সেখানে বসে রইল চিন্তায় ডুবে, আর মনে হতে লাগল কে যেন বাইরে খড়খড়িতে ধাক্‌কা মারছে আর শিস দিচ্ছে।

পরদিন সকালে ঠাকুমা আক্ষেপ করে জানালেন বাতাসে সব আপেলগুলো ঝরে পড়ে গেছে আর বুড়ো একটা কুল গাছের গুঁড়ি দোফালা হয়ে চিরে

গেছে। ধূসর, মলিন, নিরানন্দ সকালটা, এক একদিন যেমন মনে হয় সাত সকালেই আলো জেলে রাখি সেই রকম। সবাই নালিশ জানাল বড়ো ঠাণ্ডা, আর জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে চলল টোকা। প্রাতরাশের পর নাদিয়া গেল সাশার ঘরে, তারপর একটাও কথা না বলে কোণে একটা চেয়ারের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। দুহাতে ঢেকে ফেলল মুখখানা।

সাশা প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?'

নাদিয়া বলে উঠল, 'এভাবে আমি আর পারছি না, পারছি না! জানি না আগে এখানে কী করে ছিলাম, একেবারে বুঝতে পারি না! আমি আমার বাগদত্তকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি নিজেকে, এই অলস, শূন্য জীবনের সবটাকে আমি ঘৃণা করি ...'

সে কী বলছে, তখনো না বুঝে সাশা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে ... ওসব কিছু নয় ... সব ঠিক আছে!'

নাদিয়া বলে চলল, 'আমার কাছে এই জীবনটা ঘৃণায় ভরা, এখানে আমি আর একটা দিনও টিকতে পারব না — কাল চলে যাব এখান থেকে। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে!'

এক মুহূর্ত সাশা তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর শেষ পর্যন্ত সত্যটি সে উপলব্ধি করল; শিশুর মতো আনন্দে মত্ত হয়ে উঠল সে, দু'হাত তুলে নাচাল, ঢিলে চটি পায়ে তড়বড় করে উঠল, যেন আনন্দে নাচছে।

হাত রগড়ে সে বলল, 'চমৎকার। কী অপূর্ব, ভগবান!'

বিস্ফারিত দুই পলকহীন চোখে নাদিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার চাউনিতে ভালোবাসা যেন সে মোহিত হয়ে গেছে। সে অপেক্ষা করে রইল, কিছু তাৎপর্যময়, অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কথা একটা বলবে সাশা। এ পর্যন্ত সাশা কিছু বলেনি তাকে, কিন্তু তার মনে হতে লাগল কী যেন নূতন আর বিরাট, যা সে আগে কখনো জানেনি, কিছু তার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। প্রত্যাশা নিয়ে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এখন সে সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত, প্রস্তুত মরতেও।

সাশা বলল একটু পরে, 'কাল আমি যাচ্ছি। আমাকে বিদায় দিতে আসতে

পারেন স্টেশনে। আপনার জিনিসপত্র আমি আমার ট্রাঙ্কে নিয়ে নেব আর একটি টিকিট কেটে রাখব' খন আপনার জন্য। তারপর যখন তিনবারের ঘণ্টা বাজবে আপনি তখন চাপবেন ট্রেনে, ব্যস চলে যাব আমরা। আমার সঙ্গে যাবেন মস্কো পর্যন্ত, তারপর একলা যাবেন পিটার্সবুর্গে। আপনার পাসপোর্ট আছে?'

'আছে।'

সাশা বলল সোৎসাহে, 'কখনো আপনি অনুতাপ করবেন না, এর জন্য কোনো অনুশোচনার কারণ থাকবে না আপনার, আমি জানি! চলে যাবেন আপনি, পড়াশুনো করবেন, তারপর দেখবেন সব চলছে ঠিক ঠিক আপন গতিধারায়। নিজের জীবনকে যখনি ওলট পালট করে ফেলবেন তখনই বদলে যাবে সবকিছু। আসল বড়ো কথাটা হচ্ছে নিজের জীবনটাকে ওলট পালট করে ফেলা, তারপর আর কিছু আসে যায় না। তাহলে আমরা যাচ্ছি কাল?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়! ঈশ্বরের দোহাই!'

নাদিয়া কল্পনা করে নিয়েছে গভীর একটি আলোড়ন এসেছে তার মধ্যে, মনে করেছে তার হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত আগে আর কখনো হয়নি। সে নিশ্চিত বুঝল যাত্রার প্রাক্‌কালে ভয়ানক কষ্ট পাবে সে, তীব্র মনস্তাপের যন্ত্রণায় পীড়িত হবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে সে ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে। মুখে অশ্রুর ছাপ আর ঠোঁটে মৃদু হাসি মেখে সে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা নিটোল ঘুমল।

৫

ভাড়া গাড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে। কোট গায়ে, টুপি মাথায় নাদিয়া ওপরে উঠে গেল। একবার মাকে শেষ দেখা দেখে আসবে, দেখে আসবে সেই সব জিনিস যা এতকাল তার ছিল। ঘরে, তখনো-উষ্ণ বিছানাটির পাশে সে দাঁড়াল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল মায়ের ঘরে। নিনা ইভানভনা নিদ্রিতা, ঘরখানায় নিবিড় নিস্তব্ধতা। মাকে চুমু খেয়ে, চুলগুলোয় একটু হাত বুলিয়ে সোজা করে দিয়ে নাদিয়া দুয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ... তারপর ধীর পায়ে নেমে এল নীচে।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে চুপসে একটা গাড়ি দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে, গাড়িটার হুড তোলা।

চাকর যখন মালপত্র গাড়িতে তুলতে শুরু করল, ঠাকুমা বললেন, 'তোমার জায়গা হবে না, নাদিয়া। এই আবহাওয়ায় তুমি সাশাকে তুলে দিতে যেতে চাও — আমার অবাক লাগছে! বাড়িতেই থাকো বরং! বৃষ্টিটা একবার দেখ!'

নাদিয়া একটা কিছু বলতে চাইল, পারল না। সাশা তাকে ধরে তুলল গাড়িতে, তারপর কম্বল দিয়ে হাঁটু দুটো ঢেকে দিল। এবার সে গিয়ে বসল ওর পাশে।

দাওয়া থেকে ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'এসো বাছা! ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। মস্কো পেঁছেই চিঠি দিও কিন্তু, সাশা, মনে থাকে যেন!'

'আচ্ছা চলি এবার, ঠাকুমা!'

'স্বর্গের রাণী তোমাকে রক্ষা করুন!'

'কী দিন বাবা!' সাশা বলল।

আর ঠিক তখনই কাঁদতে লাগল নাদিয়া। এই এখনই সে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে, সে চলে যাচ্ছে সত্যি সত্যি; চলে যাচ্ছে — কথাটা সে এ যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি। ঠাকুমার কাছে বিদায় নেবার সময়ও না, কিংবা মায়ের পাশে যখন দাঁড়িয়েছিল, তখনও না। বিদায় শহর! প্রবল বেগে তার মনে এল সবকিছু — আন্দ্রেই, তার বাবা, নতুন বাড়িটা, ফুলদানী সমেত নগ্ন সেই নারী। কিন্তু এসব আর এখন তাকে আতঙ্কিত করল না, বুকে ভার হয়ে বসল না। ও সব তুচ্ছ, মূঢ়, অর্থহীন হয়ে গেছে। সব অপসরণ করে যাচ্ছে দূরে আরো দূরে, অতীতে। তারপর যখন তারা রেলগাড়িতে চাপল, ছেড়ে দিল ট্রেনটা, তখন এই সমগ্র অতীতটা, সেই বৃহৎ এবং গুরুতর অতীতটা ছোট্ট একটা পিন্ডমাত্রে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, আর সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল প্রসারিত এক বিরাট ভবিষ্যৎ, যা এখনো তার প্রত্যক্ষ বোধের প্রায় বাইরে। জানালায় টপ টপ করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টিবিন্দু, কেবল সবুজ মাঠ প্রান্তর, দ্রুত অপসৃয়মান টেলিগ্রাফ পোস্টগুলি, তারের ওপর পাখিরা — এ ছাড়া আর দেখা যায় না কিছু; সহসা একটি আনন্দে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ

হয়ে যেতে চাইল। মনে পড়ল সে চলেছে মুক্তি পেতে, পড়াশুনা করতে। মনে পড়ল, এমন একটা কাজ সে করছে যাকে আগেকার দিনে লোকে বলত, 'কসাকদের কাছে পালিয়ে চলে যাওয়া।' সে হেসে উঠল, কেঁদে ফেলল, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল।

একগাল হেসে সাশা বলল, 'এই দেখ দেখ, এসো, দেখ কাণ্ড! এসো! কী করে দেখ!'

৬

হেমন্ত পার হয়ে গেল, তারপর শীতও। নাদিয়ার এবার বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে। রোজ রোজ সে ভাবে তার মায়ের আর ঠাকুমার কথা, সাশার কথাও ভাবে। বাড়ির চিঠিপত্রে একটা শান্ত আর সহৃদয়তার সুর, সব কিছু যেন ভুলে যাওয়া হয়েছে, ক্ষমা করা হয়েছে। মে মাসের পরীক্ষা পাশ করে সুস্থ দেহে খুশি মনে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। মাঝপথে থামল মস্কোয় সাশাকে দেখে যাওয়ার জন্য। এক বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে সাশা — এক মুখ দাড়ি, অমার্জিত কেশ বেশ, পরনে সেই ক্যাম্বিসের প্যাংলুন, গায়ে সেই পুরানো সাবেকি ফ্যাশনের লম্বা কোট, চোখদুটি বরাবরের মতো তেমনি ডাগর আর সুন্দর। কিন্তু তাকে অসুস্থ আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, আরো রোগা হয়ে গেছে সে, আরো বয়স্ক হয়ে গেছে। আর অবিশ্রান্ত কাশছে। তাকে নাদিয়ার মলিন আর গ্রাম্য মনে হল।

'আরে নাদিয়া যে!' বলে সে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে হাসতে হাসতে। 'আমার লক্ষ্মী, আমার সোনা!'

লিথো কর্মশালায় তামাকের ধোঁয়ায় আর রং আর কালির দম-আটকানো গন্ধের মধ্যে ওরা বসল দুজনে, তারপর সাশার ঘরে এল তারা। তাতেও ভুর ভুর করছে তামাকের গন্ধ। ঘরটা নোংরা, আগোছালো। ঠান্ডা সামোভারের পাশে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা ভাঙা প্লেট, তাতে একটুকরো কালো কাগজ, আর সারা মেঝেটায় এবং টেবিলে ছড়িয়ে আছে অজস্র মরা মাছি। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে সাশা তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো চিন্তা করে না, সর্বদাই বাস করে বিশৃংখলার মধ্যে, আরাম আয়েসের প্রতি একটা অসীম অবজ্ঞা নিয়ে। যদি কেউ তার ব্যক্তিগত সুখ ও

জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করত, যদি প্রশ্ন করত এমন কেউ আছে কিনা যে তাকে ভালোবাসে, তবে সে প্রশ্নের মানেই সে বুঝতে পারত না, কেবল হেসে ফেলত খানিকটা।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'সবকিছু ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে. হেমন্তে মা এসেছিলেন পিটার্সবুর্গে, আমায় দেখতে এসেছিলেন। বলেছেন ঠাকুমা রাগ করেননি। কেবল বার বার আমার ঘরে গিয়ে দেয়ালে ক্রুশ আঁকেন।'

সাশাকে প্রফুল্ল দেখাল, কিন্তু সে কাশছে আর কথা বলছে ভাঙা গলায়। নাদিয়া বার বার তাকাতে লাগল তার দিকে, ভাবতে লাগল সে কি সত্যি গুরুতর অসুস্থ, না কি সব তার নিজের কল্পনা।

সে বলল, 'সাশা, লক্ষ্মী সাশা! কিন্তু আপনি যে অসুস্থ!'

'আমি ঠিক আছি। একটুখানি অসুখ — ও তেমন কিছু নয় ...'

আকুল স্বরে নাদিয়া বলল, 'কিন্তু দোহাই আপনার, ডাক্তার দেখান না কেন? স্বাস্থ্যের যত্ন নেন না কেন আপনি, সাশা?' মৃদুকণ্ঠে সে বলল, আর চোখদুটি তার জলে ভরে উঠল। কেন যেন আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ, আর সেই ফুলদানীর কাছে নগ্ন নারীচিত্রটি, আর তার সমগ্র অতীত জীবন — যা আজ সেই ছোটোবেলার মতো সুদূর অতীত — সবকিছু তার মনের সামনে উঠল ভেসে। কাঁদতে লাগল সে; গেল বছরের মতো সাশা আর তার কাছে তেমন নতুন, তেমন চতুর, তেমন আকর্ষণীয় নেই। 'লক্ষ্মী সাশা, আপনি ভয়ানক অসুস্থ. আপনি যাতে অমন ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে না যান তার জন্য কী আমার অদেয় জানি না! আপনার কাছে বড়ো ঋণী আমি। আমার জন্য কত প্রচুর যে আপনি করেছেন তা আপনার নিজের জানা নেই। লক্ষ্মীটি সাশা! আমার জীবনে আজ আপনিই সব থেকে ঘনিষ্ঠ, আপনিই প্রিয়তম, জানলেন।'

বসে বসে তারা আলাপই করে চলল। একটা শীত নাদিয়া কাটিয়ে এসেছে পিটার্সবুর্গে, এখন তার মনে হতে লাগল: সাশার প্রত্যেকটি কথায়, তার হাসিতে, তার সমগ্র সত্তার মধ্যে যেন টের পাওয়া যায় এমন একটা কিছু যা বাতিল হয়ে গেছে, যা সাবেকি, যা সমাপ্ত, এমন কিছু যা সম্ভবত অর্ধ-কবরস্থ হয়ে গেছে।

সাশা বলল, 'পরশুদিন আমি যাচ্ছি ভলগায় বেড়াতে। তারপর সেখান

থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে কুমিস্* নেব। কুমিস্ পরখ করে দেখতে চাই। আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। স্ত্রীটি অপূর্ব। চেষ্টা করছি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে দিতে পারি কিনা। তিনি তাঁর জীবনটাকে ওলট পালট করে দিন — তাই আমি চাই।'

কথার ঝুলি ফুরোলে তারা গেল স্টেশনে। সাশা তাকে চা খাওয়াল আর আপেল এনে দিল কয়েকটা। ট্রেন ছাড়লে সাশা হাসিমুখে রুমাল নাড়তে লাগল, আর নাদিয়া শুধু তার পায়ের দিকে তাকিয়ে টের পেল কী সাংঘাতিক অসুস্থ সে, টের পেল বেশি দিন আর তার বাঁচার আশা নেই।

আজন্ম পরিচিত শহরে নাদিয়া এল দুপুরবেলায়। স্টেশন থেকে গাড়ি চেপে বাড়ি আসতে আসতে রাস্তাগুলি তার বেমানান রকম চওড়া মনে হল, আর বাড়িগুলিকে অত্যন্ত ছোটো আর বেঁটে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই, একমাত্র যার সঙ্গে দেখা হল সে হচ্ছে সেই পুরানো ওভারকোট গায়ে পিয়ানোর সুর-বাঁধার জার্মান কারিগর। বাড়িগুলো যেন ধুলোর একটা স্তরে ঢেকে গেছে। ঠাকুমা এখন সত্যি বুড়ি হয়ে গেছেন, কিন্তু আগেকার মতোই স্থূলকায়া সাদাসিধে রয়েছেন। নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, মুখখানা তাঁর লেগে রইল তার কাঁধে। যেন উনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। নিনা ইভানভনারও বেশ বার্ধক্য দেখা দিয়েছে, তাঁর চেহারার জৌলুস চলে গেছে, আর যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু জামাকাপড় কাঁচুলি তাঁর আগের মতোই আঁটোসাঁটো আর আঙুলে এখনো ঝকঝক করছে হীরের আংটিগুলি।

সারা শরীর তাঁর কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন, 'আমার সোনা লক্ষ্মী খুকী আমার!'

তারপর তারা বসে নীরবে কাঁদতে লাগল। সহজেই বোঝা যায় ঠাকুমা এবং মা — দুজনেই স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন যে, অতীত চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে আর কখনো ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, তাঁদের পুরানো প্রতিষ্ঠা, বাড়িতে অতিথিদের আমন্ত্রণ করার অধিকার— সব শেষ হয়ে গেছে। নির্ঝঞ্ঝাট, সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে যদি সহসা এক রাত্রিতে পুলিস ঢুকে বাড়িতে তল্লাসী করে আর আবিষ্কার হয়ে

* ঘোড়ার দুধ।

যায় যে গৃহকর্তা কোনো একটা তহবিল তছরূপ করেছেন বা জালিয়াতি করেছেন, এমনি একটা অবস্থা হলে লোকের যে অনুভূতি হয় এ'দেরও ঠিক তাই ওখন অভ্যস্ত নির্ঝঞ্ঝাট সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রাকে চিরকালের মতো বিদায় দিতে হয়!

ওপরে গেল নাদিয়া। দেখল সেই একই শয্যা, একই জানালা, তাতে টাঙানো একই সাদা সাধারণ পর্দা। জানালা থেকে দেখা বাগানের সেই একই দৃশ্য—সূর্যের আলোয় প্লাবিত, উল্লসিত, জীবনের কোলাহলে মুখরিত। সে তার টেবিলে হাত ছোঁয়াল, বসল, একটি জাগর-স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। আহারটি দিব্যি হয়েছে, আহারের পর ঘন সুস্বাদু ক্রিম দিয়ে চা খেয়েছে সে। কিন্তু কী যেন একটা নেই, ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, আর সিলিংটা যেন ভারি নীচু। সন্ধ্যায় সে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুতে গেল, কিন্তু এই উষ্ণ, অতি নরম বিছানাটায় শোয়ার মধ্যে হাস্যকর কী যেন একটা ব্যাপার আছে।

এক মুহূর্তের জন্য এলেন নিনা ইভানভনা। অপরাধীর মতো বসলেন ভয়ে ভয়ে, চোখে চোরা চাউনি নিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর, নাদিয়া, কেমন চলছে সব? তুমি সুখী হয়েছ? সত্যি সুখী?'

'হ্যাঁ, মা।'

নিনা ইভানভনা উঠে নাদিয়ার গায়ে আর জানালার ওপরে ক্রুশ আঁকলেন।

বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ আমি ধর্মভীরু হয়ে উঠেছি। এখন দর্শন পড়ছি জানো, আর ভাবছি, কেবল ভাবছি ... এখন অনেক কিছু আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমার মনে হয় প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'মা, ঠাকুমা সত্যি কেমন আছেন?'

'মনে হয় ঠিক আছেন। তুমি যেদিন সাশার সঙ্গে চলে গেলে, সেদিন ঠাকুমা তোমার টেলিগ্রাম পড়ে ঠায় পড়ে গেলেন মাটিতে। তারপর তিনদিন একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়েছিলেন বিছানায়। তিনদিন পরে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু এখন ভালোই আছেন।'

উঠে নিনা ইভানভনা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

চৌকিদারের ঘণ্টা শোনা গেল, 'টিক-টক, টিক-টক।'

নিনা ইভানভনা বললেন, 'বড়ো কথাটা হচ্ছে প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। তার মানে আমাদের চেতনায় জীবনটাকে ভাগ করে নিতে হবে তার মৌলিক সরল উপাদানে, সূর্যালোকের সাতটা প্রাথমিক বর্ণ যেমন, সেইভাবে। তারপর প্রত্যেকটি উপাদান আলাদা আলাদা করে অধ্যয়ন করতে হবে।'

নিনা ইভানভনা আরো কী বললেন, আর কখনই বা তিনি চলে গেলেন নাদিয়া জানতে পারল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাড়াতাড়ি।

মে মাস কেটে গেল, এল জুন। নাদিয়ার আবার বাড়ি থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। ঠাকুমা বসে থাকেন সামোভারের পাশে, চা ঢেলে নেন আর দীর্ঘশ্বাস নেন বুক ভরে। সন্ধ্যায় দর্শনের কথা বলেন নিনা ইভানভনা। এখনো তিনি থাকেন পরাধীনের মতো, কয়েকটা কোপেকের দরকার হলে হাত পাততে হয় ঠাকুমার কাছে। বাড়িটা মাছিতে ভরে গেছে, আর সিলিংগুলো যেন ক্রমাগত নীচে নামছে। ফাদার আন্দ্রেই এবং আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ঠাকুমা আর নিনা ইভানভনা কখনো বাইরে বেরোন না। নাদিয়া ঘুরে বেড়ায় বাগানে, রাস্তায় রাস্তায়। বাড়িঘরগুলি আর পুরানো মলিন বেড়াগুলো দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে, তার মনে হয় শহরে সবকিছু বহুকাল থেকেই পুরানো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় সব মরে গেছে অনেক আগে। এখন সে প্রতীক্ষা করছে শেষ সমাপ্তির কিংবা সজীব এবং নবীন কিছুর সূচনার। আঃ, কবে শুরু হবে সেই নূতন, খাঁটি নিষ্কলুষ জীবনটা, যখন একেবারে সোজা সামনে এগিয়ে যাওয়া যাবে, যখন নির্ভীক দৃষ্টিতে তাকানো যাবে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে চোখাচোখি, নিজে ঠিক পথে আছি—এই আত্মবিশ্বাস দেখা দেবে, যখন সুস্থ মুক্ত আনন্দিত হয়ে ওঠা যাবে! এ জীবন আসবেই, দ্রুত হোক আর দেরীতে হোক আসতে বাধ্য। একটা সময় আসবে যখন এই ঠাকুমার বাড়ির — যে বাড়িতে চার চারটি চাকরের পক্ষে একমাত্র পথ হল একতলার একটাই ঘরের মেঝেতে নোংরামির মাঝখানে বাস করা   হ্যাঁ, একটা সময় আসবে যখন এরকম একটা বাড়ির অবশেষও আর থাকবে না, যখন এর কথা ভুলে যাবে প্রত্যেকে, যখন এ বাড়ির কথা স্মরণ করারও কেউ থাকবে না এইসব

চিন্তা-ভাবনা থেকে নাদিয়াকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় কেবল ওই পাশের বাড়ির ছোটো ছেলেগুলি। সে যখন বাগানে পায়চারি করে বেড়ায় ওরা তখন বেড়া পিটিয়ে হাসে আর চেঁচিয়ে বলে, 'ওই দেখ বিয়ের কনে!'

সারাতভ থেকে চিঠি এল একখানা, সাশার চিঠি। সে তার অসাবধান, বাঁকাচোরা দ্বিধাগ্রস্ত হস্তাক্ষরে লিখেছে, ভলগায় বেড়ানোর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। কিন্তু সারাতভে সে অসুস্থই হয়ে পড়েছে, গলার স্বর হারিয়েছে, এবং গত একপক্ষকাল হাসপাতালে রয়েছে সে। এর মানে বুঝল নাদিয়া, প্রায় দৃঢ় বিশ্বাসের মতো-একটা অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে চেপে ধরল। কিন্তু এই অমঙ্গল আশঙ্কা, এমন কি সাশারই চিন্তা তাকে আর আগের মতো বিচলিত করে না দেখে সে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল। সে অনুভব করল বাঁচবার একটা অদম্য স্পৃহা, পিটার্সবুর্গে যাওয়ার কামনা, আর সাশার সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব তা যেন অতীতের বস্তু, সে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গ প্রিয় হলেও আজ যেন বহু দূরের বস্তু। সারা রাত সে ঘুমুতে পারল না, সকালে উঠে বসল জানালায়, যেন কান পেতে কিছু শুনছে। আর সত্যি সত্যি গলার আওয়াজ শোনা গেল একতলা থেকে—ঠাকুমা কী যেন বলছেন অসন্তুষ্ট দ্রুতস্বরে। তারপর কেঁদে উঠল কে ... নাদিয়া নেমে এসে দেখল ঠাকুমা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন, তাঁর মুখে অশ্রুর ছাপ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একখানা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটি তুলে নিয়ে পড়বার আগে নাদিয়া অনেকক্ষণ পায়চারি করল ঘরের মধ্যে, ঠাকুমার কান্না শুনতে শুনতে। তারপর টেলিগ্রাম দেখল। জানান হয়েছে, গতকাল সকালে, সারাতভে, আলেক্সান্দ্র তিমফেইচ, সংক্ষেপে সাশা, যক্ষ্মায় মারা গেছে।

ঠাকুমা এবং নিনা ইভানভনা মৃতের সদগতি কামনায় উপাসনা করতে গেলেন গীর্জায়, আর নাদিয়া ঘরময় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো চিন্তা করতে করতে। সে হৃদয়ঙ্গম করল তার জীবনটা গেছে ওলট-পালট হয়ে, সাশা চেয়েছিল তাই। উপলব্ধি করল সে বড়ো একাকী, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, পর, এখানে অবাঞ্ছিত। বুঝল এখানে আর তার কিছু চাওয়ার নেই। অতীতটা ছিন্ন হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে, যেন তা পুড়ে গেছে আগুনে আর তার ভস্মরাশি ছড়িয়ে গেছে হাওয়ায় হাওয়ায়। সাশার ঘরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'বিদায়, বন্ধু সাশা।' জীবন তার সম্মুখে প্রসারিত। একটি নূতন, বিস্তৃত বিশাল জীবন, অস্পষ্ট রহস্যময়। তবু এ জীবন তাকে আহ্বান করল ইসারায়, তাকে টানল সামনে।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে সে গেল ওপরে। পরের দিন সকালে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর আনন্দে আর উৎসাহময় সাহসের সঙ্গে শহর ছেড়ে সে চলে গেল— আর আসবে না ফিরে, সে কথা সে নিশ্চিত জানে।

১৯০৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অন্‌বাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত
হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জ়ুবোভ্‌স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union